জীবন-স্মৃতির

ভূমিকা

(ডঃ) প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি. এ.
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন, ১৩৬৭

মুদ্রাকর :
শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
এস. প্রিন্টার্স
২৭।৩বি, হরি ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

সুদীর্ঘ জীবন পথে সকল সুখে-দুঃখে সম্মানে-অসম্মানে
সমভাবে আমার জন্য যাঁরা প্রীতি, ভালবাসা ও
শ্রদ্ধা ঢেলে এসেছেন নিঃস্বার্থভাবে—আমার
এ জীবন-আলেখ্য তুলে দিলাম
তাঁদেরই হাতে।



জন্ম ২৪ ডিসেম্বর ১৮৯১

জীবন-স্মৃতি

ভূমিকা

১৯৪৪ সালে কল্যাণীয়া মা সাধনার অনুরোধে তার সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'সবিতা'য় জীবন-স্মৃতি লিখতে আরম্ভ করি। তের সংখ্যায় ভূমিকা শেষ হলে ভাল করে পড়ে দেখি একদিকে আয়তনে বড় হয়েছে অপরদিকে আরো অনেক জিনিস এর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল। তাই মনে হয় একেবারে নূতন করে লিখতে হবে। এরপর কয়েক বছর অতীত হয়েছে। তার মধ্যেও অনেক ঘটনা ঘটেছে যার উল্লেখ প্রয়োজন। নূতন করে কাজে হাত দিয়ে বুঝেছি এ বিষয়ে প্রধান অন্তরায় আমার স্মৃতিশক্তি। যদিও এজন্য আমি চিরদিনই ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ। আজ ভাল-মন্দ, মিষ্টি-তেতো, কটু সব অভিজ্ঞতাই মনের সামনে ভিড় করে আসছে। সব কথা লিখে লাভ নেই। কিন্তু যেটুকু না লিখলে সত্যের অপলাপ হয় বা ইতিহাস অসম্পূর্ণ রয়ে যায় তা লিখতেই হবে এবং লিখবও নিঃসঙ্কোচে।

১৯৪০ সালের ২৪শে ডিসেম্বর ৮০ বছরে পদার্পণ করার দিন সক্রিয় রাজনীতি হতে অবসর গ্রহণ করেছি। রাজনীতি নীচুস্তরের জিনিস বলে নয়। আমি মনে করি যে, যে সৎভাবে রাজনীতি করে সেও সাধু, আর যে সাধু সত্যিকারের সাধু জীবনযাপন করে সেও দেশপ্রেমিক। আজ আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে চাই সকলের কল্যাণ। যারা অন্যায় আচরণ করছে কিছুদিন আগেও মনে মনে বলতাম 'ভগবান, তুমি এদের বিচার করো'। এখন বলি—'ভগবান, তুমি এদের সুবুদ্ধি দাও, এদেরও কল্যাণ হোক!' আজ জীবন-সন্ধ্যায় উপনীত। ভুলতে পারি না যে, জীবনের দুই প্রধান আকাঙ্ক্ষা:—(১) সমদৃষ্টি ও (২) আত্মোপলব্ধি এখনো পূর্ণ হয়নি। বহু দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও নিজেকেই এখনো সবার চেয়ে বেশী ভালবাসি। প্রাণের ইচ্ছা সকলকে নিজের মত ভালবাসা। তা এখনো পারিনি।

তবে যেভাবে সারাজীবন ভগবানের অনুগ্রহ পেয়েছি তা হতে মনে হয় ভগবান আমার এই দুই আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ করবেন। ভগবানের অনুগ্রহের উপরই আমার সব চেয়ে বড় ভরসা। তাই জীবনে কোন ক্ষোভ নেই, আছে আনন্দ।

জন্মেছি ১৮৯১ সালে ২৪শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার (বাংলা ১২৯৮ সাল ৮ই পৌষ) পূর্ব বাংলার ঢাকা জিলার এক গণ্ডগ্রাম মালিকান্দায়। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে বিশেষ করে বাংলায় এক নবজাগরণ। বহু মহাপুরুষ ও মনীষী জন্মগ্রহণ করেন তখন বাংলায়। তাঁদের প্রভাব তখন বাংলার আকাশে-বাতাসে, সুদূর গ্রামাঞ্চলেও। আমাদের বংশ ছিল বেশ ধর্মভাবাপন্ন। তবে তার মধ্যে কুসংস্কারও ছিল বেশ খানিকটা। ছোটবেলায় মালিকান্দা অঞ্চলে ম্যালেরিয়া জ্বর ছিল ব্যাপক। আর ভাল পানীয় জলের অভাবে পেটের অসুখ এবং কলেরা রোগও ছিল ব্যাপক। কোন নলকূপ ছিল না তখন গ্রামে। ১৯০৩ সালে আমার চেয়ে দুই বছরের ছোট সহোদর বোনের ম্যালেরিয়া রোগে মৃত্যু আমার জীবনের প্রথম বিশেষ দুঃখজনক ঘটনা। ঐ সময় আমিও ম্যালেরিয়া জ্বরে কয়েকমাস ভুগে একপ্রকার মৃত্যুর হাত হতে বেঁচে উঠি। কিন্তু পানীয় জলের জন্য নলকূপ হওয়ায় ও নৈসর্গিক কারণে ১৯২১ সালের পর মালিকান্দা অঞ্চল হয় এক স্বাস্থ্যকর স্থান। আমাদের বংশ ছিল বেশ কৃষ্টিসম্পন্ন। কিন্তু বংশের আমিই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাই। ঠাকুরদাদা ছিলেন মোটামুটি সঙ্গতিপন্ন ও ধর্মপরায়ণ। তিনি যখন মারা যান তখন তাঁর তিন ছেলেই নাবালক। বাবা সবার ছোট। ধর্মপরায়ণা, বুদ্ধিমতী ও কর্মঠ ঠাকুরমা সংসার চালিয়ে নেন। তিনি প্রায় একশ বছর বাঁচেন। আমি ছোটবেলায় তাঁরই আদর-যত্নে লালিত-পালিত। ছোটবেলায় তাঁকে বলতে শুনেছি—"মা'রা পেটে সন্তান থাকতে ভগবদ্ চিন্তা করবে, রামায়ণ মহাভারত পড়বে তবে সুসন্তান হবে"। বাবা পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়েছিলেন। হুন প্রাথমিক

স্কুলের শিক্ষক। সংসার চলত খানিকটা দুঃখ-কষ্টে। তবু ছেলেবেলায় যা খেয়েছি আজ খুব কম ধনী পরিবারের ছেলে তা পায়। বাবা ছিলেন ধর্মপ্রাণ, মা বিনোদনী দেবীও ছিলেন খুব ধর্মপ্রাণ ও সরল প্রকৃতির। তিনি সামান্য বাংলা লেখাপড়া জানতেন। তাঁর কাছে আমার হাতেখড়ি। আর বাবাই আমার প্রথম শিক্ষক। মা-বাবা দুজনেই চেয়েছিলেন আমাকে সুশিক্ষিত করে তুলতে। তাঁরা উভয়েই —বিশেষ করে মা—এজন্য কোন কষ্টকেই কষ্ট মনে করতেন না। আমিও মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করতাম।

বাবার কাছে পড়া শেষ হলে পড়ি বাড়ীর মাইনর স্কুলে। গ্রাম্য দলাদলিতে সেটি উঠে গেলে বাড়ী থেকে প্রায় আড়াই মাইল দূরে দেবীনগর মাইনর স্কুলে পড়তে যাই। অল্প বয়সে অতদূর যাতায়াত আর বর্ষাকালে নৌকায় যাতায়াতের খরচ—এই দুইই অসুবিধার কারণ হয়েছিল। কিন্তু লাভ হয় দুটি। এই স্কুলের হেড পণ্ডিত শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে বাংলা শিখি ভাল করে। গ্রামের স্কুলে থাকলে সে সুযোগ হত না। দ্বিতীয় লাভ হল বর্ষাকালে নৌকার মাঝি ইলাহীর মহত্ত্ব উপলব্ধি। তার কাছে যে প্রাণের পরশ পাই তা আজও মনে পড়ে। নৌকায় স্কুলে যাতায়াতের সময় রাস্তায় একটি 'বায়র' (ছোট হ্রদ) পড়ত। একটু জোর হাওয়া হলেই তাতে উঠত বিরাট ঢেউ। তখন ইলাহী আমাকে সাহস দিয়ে নির্ভয় করে রাখত। সে নিজে আল্লার নাম নিত ও আমাকে ভগবানের নাম নিতে বলত। ছোট ভাইয়ের চেয়েও বেশী স্নেহ করত আমাকে। ১৯২১ সালের পর তার আর কোন খবর পাইনি; বোধ হয় সে আর জীবিত নেই। দুঃখ তার ঋণ বিন্দুমাত্র শোধ করতে পারিনি। নিম্ন প্রাইমারী, উচ্চ প্রাইমারী, ছাত্রবৃত্তি, মাইনর সবই পাশ করি প্রথম বিভাগে। শেষ পরীক্ষায় বৃত্তি পাওয়ার আশা করেছিলেন শিক্ষকরা। কিন্তু অনেক-দিন ম্যালেরিয়া জ্বরে অসুস্থ থাকায় তাঁদের সে আশা পূরণ করতে পারিনি।

মাইনর পাশ করে ১৯০৫ সালে ভর্তি হই ভাগ্যকুল হাই স্কুলে। এই সালে বাংলায় আরম্ভ হয় বঙ্গভঙ্গ রদ বা স্বদেশী আন্দোলন। ৩০শে আশ্বিন বা ১৬ই অক্টোবর মনে মনে শপথ করি, দেশ স্বাধীন করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করব। এখন হতে তিনমুখী হল আমার জীবনের প্রচেষ্টা—(১) ভালভাবে শিক্ষা লাভ, (২) ধর্ম জীবন যাপন ও (৩) দেশসেবা। আমার বয়স তখন ১৪ চলছে। ছোটবেলায় লেখা-পড়ার সঙ্গে খেলাধূলা করতাম। খেলতাম হাডুডু, দাড়্যাবান্ধা, গোল্লাছুট, ক্রিকেট, ফুটবল। এবার আরম্ভ হল ডন, বৈঠক, কুস্তি, লাঠিখেলা প্রভৃতি। এই সবেই আমি ছিলাম সাধারণ স্তরের। খুব ছোট থাকতে নৌকা বাওয়া ও সাঁতার শিখি। একটু বড় বয়সে ঝড়ো হাওয়ায় পদ্মানদার বিরাট ঢেউ উঠলে তাতে সাঁতার দেওয়া ছিল আমার এক সখ—যদিও আমি সাঁতারে পারদর্শী নই। নৌকা বাওয়ায় বেশ পারদশা হই। বাড়ীর ও গ্রামের বড়রা খুব তাস, পাশা, দাবা খেলতেন। তাঁদের দেখাদেখি এই সব খেলা শিখি। তাস খেলায় হই পারদর্শী। বেশী বয়সে শিখি টেনিস ও ব্যাডমিণ্টন খেলা। ছোট থেকেই ফুল বাগান করার সখ ছিল আমার। ফুল চাষে আমার উৎসাহ সারাজীবন। যখনই সুযোগ পেয়েছি—করেছি। ফুল বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই আমার ধারণা। অকাতরে সবাইকে সুগন্ধ ও সৌন্দর্য বিলায়, কোন প্রতিদানের অপেক্ষা না করে। ছোটবেলায়ই বাড়ীতে মা'র সঙ্গে শাকসব্জি তৈরীর কাজ করতাম খুব উৎসাহ সহকারে। পরবর্তীকালে শাকসব্জি ও ফল উৎপাদন, গোপালন ও মাছ চাষ করি। খানিকটা যোগ্যতাও অর্জন করি এসব দিকে। ১৯১৩ সালে রান্নার কাজ শিখি। ক্রমে তাতে পারদশা হই। ছোটবেলায় দেখি গ্রামাঞ্চলে পান, তামাক খাওয়ার খুব রেওয়াজ। কেউ বাড়ীতে এলে তাকে পান তামাক দিয়ে অভ্যর্থনা করা হত। ছোট ছোট ছেলেদেরও বড়দের দেখাদেখি এ অভ্যাস হত। আমার কিন্তু তা হয়নি। সারাজীবনে

১০/১২টা সিগারেট খেয়েছি। গন্ধটা খারাপ লাগায় তা ছেড়ে দিই। জীবনে পানও খেয়েছি মাত্র ১২/১৪টা। কোন ইচ্ছাই হল না পান খাওয়ার। জীবনে চাও খেয়েছি মাত্র মাস তিনেক।

ছোটবেলায় আমাদের অঞ্চলে যাত্রা, কবি, কীর্তন ও পদাবলী গান হত খুব। খুব যেতাম এ সব শুনতে। ভাগ্যকুল স্কুলে পড়ি মাত্র একবছর। আর্থিক কারণে এরপর নূতন সুরু করা গোবিন্দপুর হাই স্কুলে যাই। এই একই কারণে একবছর পরে যাই আর একটি নূতন সুরু করা নবাবগঞ্জ হাই স্কুলে। এই স্কুল হতে পরীক্ষা দিতে হলে অন্য হাই স্কুলে টেষ্ট পরীক্ষা দিতে হবে, তাই ১৯০৮ সালে গ্রীষ্মের ছুটির পর ভর্তি হই ঢাকা পোগোজ স্কুলে। মোটের উপর চারটি হাই স্কুলে পড়ি। এক স্কুলে পড়তে পারলে হয়ত পরীক্ষার ফল আরো ভাল হত। কিন্তু এতে আমার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দিক দিয়ে ভালই হয়েছিল। এন্ট্রান্স পাশ করি পোগোজ স্কুল হতে প্রথম বিভাগে। স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে স্কুলের একটি বৃত্তি পাই। এই বৃত্তি না পেলে কলেজে পড়ার কোন সুযোগই পেতাম না। প্রথম পড়ি জগন্নাথ কলেজে। পরে ঢাকা কলেজে। ঢাকায়ই ছাত্রজীবন শেষ। শিক্ষালাভে যে কয়জন শিক্ষক ও অধ্যাপকের বিশেষ সাহায্য পেয়েছি তাঁরা হলেন :—(১) বাবা পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, (২) দেবীনগর মাইনর স্কুলের হেডপণ্ডিত শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য, (৩) গোবিন্দপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বসন্তকুমার ঘোষ, (৪) ঢাকা পোগোজ স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রসন্নকুমার সেন, (৫) জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক সতীশচন্দ্র সরকার ও অধ্যক্ষ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, (৬) ঢাকা কলেজের অধ্যাপক ভূপতিনাথ দাস, অধ্যাপক ডঃ ই. আর. ওয়াট্‌সন ও অধ্যক্ষ ডবলউ. এ. জে. আর্চবল্ড। এঁদের ঋণ জীবনে শোধ করতে পারব না। এঁদের কেউ আজ জীবিত নেই। এঁদের সবাইকে জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণতি।

অঙ্ক যে নীরস বা কঠিন নয় তা বুঝি বাবার শিক্ষায়।

বাংলা শিক্ষার গোড়াপত্তন হয় শরৎপণ্ডিতের কাছে। শিক্ষা, ধর্ম, দেশসেবা সব বিষয়েই প্রেরণা লাভ করি বসন্তকুমার ঘোষের কাছে। তিনি বি. এ. পাশ করেন বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ হতে। তিনি ছিলেন ভক্ত, সুগায়ক ও সুশিক্ষক। তিনি বলতেন—"বরিশালে অশ্বিনী দত্তও আছেন, আর আছে উজিরপুরের সাক্ষী।" মিথ্যা সাক্ষী হিসাবে এরা অদ্বিতীয়। প্রথম ইংরাজীতে উত্তম শিক্ষক পাই প্রসন্নকুমার সেনকে। অধ্যাপক সতীশ সরকার পড়াতেন ভালই। ছাত্রদের স্নেহও করতেন। কিন্তু জগন্নাথ ও ঢাকা কলেজে যত বাঙ্গালী অধ্যাপকের কাছে ইংরেজী পড়েছি তাঁদের মধ্যে অধ্যক্ষ ললিতমোহন চট্টো-পাধ্যায়কে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছে। তিনি ছাত্রদের কল্যাণকামীও ছিলেন খুব। কিন্তু ডঃ ওয়াটশনের মত ছাত্র-দরদী অধ্যাপক আমার জীবনে দেখিনি। একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। ১৯১৩ সালে রসায়ন বিজ্ঞানের বি. এস-সি. পাস কোর্সের ছাত্রদের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা তদারক করছেন তিনি। একটি ছাত্রকে দেখেই বলেন—"তোমাকে ভাল দেখাচ্ছে না, তোমার কি হয়েছে?" উত্তরে ছাত্রটি বলে—"স্যার, আমার খুব বেশী জ্বর।" অধ্যাপক—"তবে এসেছ কেন?" ছাত্র—"স্যার, আমি গরীবের ছেলে। পরীক্ষা না দিয়ে এক বছর নষ্ট করার ক্ষমতা নেই।" অধ্যাপক—"তোমাকে পরীক্ষাও দিতে হবে না, এক বছর নষ্টও হবে না। তোমার সারা বছরের প্র্যাকটিক্যাল কাজের পুরা রেকর্ড আমার কাছে আছে। তুমি যদি অন্য সব বিষয়ে পাশ কর—যা আমি আশা করছি তা হলে তোমাকে পাশ বলে ঘোষণা করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে সুপারিশ করব। আশা করি বিশ্ববিদ্যালয় আমার সে সুপারিশ মেনে নেবে।" এরপর ছাত্রটি বাড়ী চলে যায়। পরীক্ষার ফল বেরোলে দেখা গেল ছাত্রটি পাশ করেছে। এই অধ্যাপকের শিক্ষাগুণে রসায়ন বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে আমি কৃতিত্ব দেখাই। ১৯২০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট

ডিগ্রী পাই। কিন্তু আধুনিক যুগে ভারতবর্ষের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত হরগোবিন্দ খোরাণার পর রসায়নের গবেষণায় সব চেয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছে যোগেন্দ্রচন্দ্র বর্ধন। সে আমার ছাত্রস্থানীয়। খুব হৃদ্যতা ছিল তার সঙ্গে। গবেষণায় তার প্রতিভার কথা আজও মনে পড়ে। সে বি. এস-সি. ও এম. এস-সি.-তে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাশ করে। তার গবেষণায় প্রতিভা দেখে বুঝলাম পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে সব সময় গবেষণায় কৃতিত্বের সম্পর্ক নেই। দুঃখের বিষয় বেশ কিছুদিন হল যোগেন আমাদের মধ্য হতে চলে গিয়েছে।

এই যুগে শিক্ষাক্ষেত্রে স্যার আশুতোষ মুখার্জীর দান চিরস্মরণীয়। কিন্তু তিনি উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উপায়ের বিশুদ্ধতা অত্যাবশ্যক মনে করতেন না। ফলে তাঁর মত শক্তিমান পুরুষের দ্বারাও বাংলার সত্যিকারের কল্যাণ হয়নি। সহপাঠীদের মধ্যে কারো কারো প্রীতি ও ভালবাসা পেয়েছি যথেষ্ট। এদের মধ্যে পোগোজ স্কুলের সহপাঠী যোগেশচন্দ্র ঘোষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার উৎসাহে প্রতি শনিবার ফরাসগঞ্জ ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের অধিবেশনে যোগ দিতাম। আমার উচ্চ শিক্ষা লাভে এবং দেশসেবার কাজে ও তার যথেষ্ট উৎসাহ ও সহানুভূতি পাই। দুঃখের বিষয় প্রীতিভাজন সহপাঠীদের কেউ আজ জীবিত নেই। ছোটবেলায়ই স্কুলের সহপাঠী কয়েকজন মুসলমান ছাত্রের সঙ্গে হয় বেশ হৃদ্যতা ও বন্ধুত্ব। ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভাব হৃদয়ে দৃঢ় হয়। সারাজীবনই হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান কাউকে সম্প্রদায় হিসাবে দেখিনি, মানুষ হিসাবে দেখেছি। এর অঙ্কুর এই ছেলেবেলার বন্ধুত্বে। ধর্মজীবনে আমার উপর প্রথম প্রভাব পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের। তারপর শ্রীঅরবিন্দের—শেষে মহাত্মা গান্ধীর। এই তিন মহাপুরুষের আশীর্বাদ আমার জীবনের মস্ত বড় সম্বল। অবশ্য প্রথম দুই মহাপুরুষের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়নি। এঁদের মধ্যে কে বড়ো সে চিন্তা আমার

মনে কখনো আসেনি। ধর্মজীবনের সামান্য অভিজ্ঞতা হতে বলতে পারি যে, প্রত্যেক মানুষকেই তার প্রকৃতি অনুযায়ী গড়ে উঠতে দিতে হবে। গাছ পূজা করেও যদি কারো আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় তার পক্ষে তাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সবার পক্ষে তা শ্রেষ্ঠ হবে একথা ভাবা ভুল। ধর্মজীবনে বৈচিত্র্যের মধ্যে যেমন ঐক্য রয়েছে তেমনি রয়েছে ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য। এই সহজ সরল সত্য মেনে চলেছি সারাজীবন।

স্বদেশীযুগে রাজনীতিক্ষেত্রে ধর্মপ্রাণ সুপণ্ডিত বাল গঙ্গাধর তিলক ছিলেন আমার আদর্শ নেতা। এই যুগে পাঁচজন নেতার প্রভাব পড়ে আমার মনের উপর:—(১) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (২) বাল গঙ্গাধর তিলক, (৩) বিপিনচন্দ্র পাল, (৪) অরবিন্দ ঘোষ ও (৫) লালা লাজপত রায়। এঁদের লেখা বক্তৃতা যা বইয়ের আকারে বেরিয়েছে তা সব পড়েছি। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের সময় নষ্ট করা চিরদিন আমার অপছন্দ। তাই সুরেন্দ্রনাথ ও তিলককে দূর থেকেই দেখেছি। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন ইংরেজীতে সুবক্তা। তাঁর মধ্যে কোন প্রাদেশিক সংকীর্ণতা ছিল না। সারা ভারতে রাষ্ট্রীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ করার কাজে তিনি ছিলেন অগ্রণী। সত্যিই তিনি ভারতের 'রাষ্ট্রগুরু'। তিলককে প্রথম দেখি কলকাতা কংগ্রেসে ১৯১৭ সালে। শুনি তাঁর সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা। অবশ্য এর পূর্বে আমার ঘরে ছিল তিলকের ছবি। নীচে লেখা 'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার'। বিপিনবাবুর বাংলা বক্তৃতা শোনা পরম সৌভাগ্য। বাংলায় এমন সুবক্তা দ্বিতীয়টি দেখিনি। তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয় ১৯২৯ সালে। মানিকগঞ্জ শহরে ঢাকা জিলা রাজনৈতিক সম্মেলন। বিপিনবাবু সেখানে আর এক সম্মেলন উপলক্ষে আসেন। আমাদের সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কিরণশঙ্কর রায় ও আমি যাই বিপিনবাবুকে আমাদের সম্মেলনে এসে বক্তৃতা দেওয়ার অনুরোধ করতে।

তিনি তখন গান্ধীজীর মতের বিরোধী। তিনি এসে বক্তৃতা দেন। আমাদের প্রাণে আঘাত লাগতে পারে এমন একটি কথাও বলেননি। এইখানে তাঁর মহত্ত্ব। কিন্তু স্বদেশী যুগের বিপিন পালকে পেলাম না এই বক্তৃতায়। লালাজী সুলেখক ও সুবক্তা। তাঁকে প্রথম দেখি ১৯২০ সালে কলকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে। তিনি তার সভাপতি। খুব সচেতন। কেউ বেফাঁস মন্তব্য করলে তা প্রত্যাহার করিয়ে নেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সৌভাগ্য হয় অপ্রত্যাশিতভাবে। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে বেলগাঁও-এ কংগ্রেস সভাপতি মহাত্মাজী। তাঁর ঘরে তাঁর সঙ্গে আলাপ করছি। এমন সময় তাঁর সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই এসে বললেন—"লালাজী এসেছেন"। মহাত্মাজী তাঁকে নিয়ে আসতে বলেন। আমি উঠে যেতে চাই। মহাত্মাজী জিজ্ঞাসা করলেন—"লালাজীর সঙ্গে তোমার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে কি?" উত্তরে 'না' বলাতে আমাকে অপেক্ষা করতে বলেন। লালাজী এলে আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তারপর আমি বলি—"আপনারা কথা বলুন, আমি বাইরে যাই।" অমনি লালাজী বললেন—"যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন।" দুই নেতার মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ। আমি নীরব শ্রোতা। কিন্তু লালাজীর—"নিছক, নূতন বলেই কোন জিনিস আমাকে আকর্ষণ করে না" এই উক্তি চিরদিন মনে রয়েছে। অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়নি। যখন তাঁর কাছে যাওয়ার কথা ভাবতে পারি তখন তিনি বছরে কয়েকদিন মাত্র দেখা দিতেন। সেরূপভাবে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য দেখা আমার মন চায়নি। চিন্তায় তাঁর সান্নিধ্যে থেকে আশীর্বাদ নেওয়া ছিল বেশী পছন্দ। দুঃখের বিষয় এই পাঁচ নেতার কেউ আজ জীবিত নেই।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একদল কিছুদিন পর সশস্ত্র বিপ্লবের পথ গ্রহণ করে। আমিও সেই পথে বিশ্বাসী হয়ে ১৯০৯ সালে ঢাকা অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত হই। অস্ত্র

সংগ্রহের জন্য টাকার প্রয়োজন। অন্যভাবে তা করা সম্ভব না হওয়ায় ডাকাতি করার নীতি গৃহীত হয়। এক ডাকাতির পর সরকার কিছু লোককে গ্রেপ্তার করে। আদালতে তাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য ভাল উকিল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করতে হয়। তাঁদের চাহিদা মেটাতে হয় টাকার অভাব। তখন করা হয় আবার ডাকাতি। ফলে আবার কিছু গ্রেপ্তার ও মামলা পরিচালনা—গড়ে উঠে এক দুষ্টচক্র। বিপ্লবের জন্য অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্য হয় একপ্রকার ব্যর্থ। এ ছাড়াও কিছু কিছু লোক হয়ে যায় পেশাদার ডাকাত। কেউ কেউ ডাকাতির টাকা আত্মসাৎও করে। কাজেই মনে হয় এ পথে দেশের স্বাধীনতা লাভ করা যাবে না। ১৯১৩ সালে এ পথ ছেড়ে দিই। এখন জোর দিই শিক্ষালাভ ও ধর্মজীবনের উপর। এ ছাড়াও মন চাইছিল স্বাধীনতাকামী ধর্মপরায়ণ লোকদের সঙ্গে যুক্ত হতে। অপ্রত্যাশিতভাবে সে সুযোগ হয় ১৯১৩ সালেই। ঢাকা কলেজের সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ভূপেশ দাসগুপ্ত ঐ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়। ঐ সালেই দামোদর বন্যা রিলিফের কাজ করতে গিয়ে পরিচয় হয় ঐ কলেজের সর্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্র সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে। এঁদের স্বাধীনতাকামী ধর্মপরায়ণ মনে করায় ভূপেশ আমাকে সব কথা জানায়। পূজার আগেই কলকাতা গিয়ে এঁদের সঙ্গ আলাপ আলোচনা করি। একযোগে কাজ করার সিদ্ধান্ত হয়। ফলে গড়ে ওঠে এক অনামী সংঘ। এই সংঘে অনেক কৃতী, বুদ্ধিমান ও ধর্মাপরায়ণ ছাত্র যুবক ছিলেন। পরবর্তী জীবনে যাদের সঙ্গে একযোগে অভয় আশ্রমে কাজ করার সৌভাগ্য হয়নি তাদের চার জনের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে:—(১) অধ্যাপক গুরুদাস গুপ্ত (গুরুদা), (২) যোগেন্দ্রনাথ সাহা, (৩) বিধুভূষণ রায় ও (৪) সুভাষচন্দ্র বসু। এই সংঘের সকলের মধ্যে গুরুদাকে আমার সবচেয়ে বেশী ধর্মপ্রাণ বলে মনে হয়। তিনি আমার চেয়ে চার

বছরের বড়। দীর্ঘদিন যাবৎ কাশীর রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে আছেন। গেরুয়া না পরা সাধু। যোগেনও আমার মত ১৯০৯ সালে এণ্ট্রান্স পাশ করে, প্রথম দশজনের একজন হয়। তার মত কুশাগ্র বুদ্ধি-সম্পন্ন হৃদয়বান লোক জীবনে খুব কম দেখেছি। সে ছিল মহাত্মাজীর অহিংসনীতিতে পুরা বিশ্বাসী। আর আমি তখন মনে করতাম অহিংসা ভীরুতাকে ঢাকবার এক সুন্দর বহিরাবরণ মাত্র। যোগেনের সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে আরো জ্ঞানের প্রয়োজন বোধ করি। তাই পড়ি ডোকসের গান্ধীজীবনী, দক্ষিণ আফ্রিকা সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে লেখা ও টলষ্টয়ের সমস্ত বই। হল মস্ত বড় লাভ। এজন্য আমি যোগেনের কাছে ঋণী। বিধু ধর্মপ্রাণ ও পদার্থবিদ্যার ভাল ছাত্র ছিল। অধ্যাপক রমনের অধীনে গবেষণা করে সুনাম অর্জন করে। পরে বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যার খয়রা অধ্যাপক হয়। ১৯২০ সালে অধ্যাপক রমনের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয় বিধু। মস্ত বড় লাভ। দুঃখের বিষয় যোগেন ও বিধু আর আমাদের মধ্যে নেই। সুভাষের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ১৯১৩ সালে কলকাতায়। বাংলা, উড়িষ্যার কয়েক জায়গায় একত্র বেড়িয়ে আমাদের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বুঝি সুভাষের মধ্যে ধর্মভাব ও সেবাভাব খুব বেশী এবং সে বেশ নির্ভীক। সুভাষ বয়সে আমার চেয়ে বছর পাঁচেকের ছোট—সে আমাকে 'প্রফুল্লদা' বলত, আমি তাকে সুভাষ বলে ডাকতাম। ১৯১৫ সালে তার সঙ্গে অনামী সংঘের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। পরবর্তী জীবনে রাজনৈতিক মতভেদও হয়। তা সত্ত্বেও আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক কখনো তিক্ত হয়নি। আমাদের কারো কারো সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বরাবরই মধুর ছিল। সুভাষ বর্তমানে নেতাজী নামেই অধিক পরিচিত। কিন্তু এ নামে তার উল্লেখ আমি কখনো করিনি। নেতাজী জার্মান Führer একমাত্র নেতা শব্দের হিন্দী রূপ। হের হিট্‌লার জার্মানীর একমাত্র নেতা ছিলেন। কিন্তু সুভাষ একনায়কত্ব চাইত না; সে ছিল

গণতন্ত্রের পূজারী। তাই তাকে নেতাজী বলা তার মতের প্রতি অমর্যাদা করা। সুভাষ জীবিত আছে কিনা এ নিয়ে অনেক বাক্-বিতণ্ডা হচ্ছে। কিন্তু আমি যে সুভাষকে জানতাম সে জীবিত থাকলে দেশের এই চরম দুর্দিনে নিশ্চয় এসে যেত।

১৯১৩ সালে কটকে থাকাকালীন উড়িয়া ভাষায় কথা বলতে শিখি। বুঝি উড়িয়া বাংলার একটি নিকটতম ভাষা। কটকেই ১৯১৬ সালে পূজার মাত্র কয়েকদিন আগে বাংলাভাষা প্রেমিক সুপণ্ডিত ও সাহিত্যিক বাঙালী অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়। তিনি ছিলেন রসিক লোক। হাসতে হাসতে বললেন—"মা দুর্গা ত আর বাংলা ভাষা বুঝেন না।" দ্বিতীয়বার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ এর প্রায় বিশ বছর পরে বাঁকুড়ায়। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করে বুঝলাম এ বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য তাঁর। আমি যত পণ্ডিতের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করেছি তাঁদের মধ্যে তাঁকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছে।

সশস্ত্র বিপ্লবাত্মক কাজ ছেড়ে দেওয়ায় লেখাপড়া ও ধর্মজীবন যাপনের জন্য একটু বেশী সময় দিতে পারি। ইতিহাস পড়ার দিকে বরাবরই আমার একটা বিশেষ ঝোঁক ছিল। ১৯১৩ সাল হতে বহু দেশের ইতিহাস, বহু দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, রাজপুত, মারাঠা ও শিখদের ইতিহাস, ভারতের অর্থনীতি সম্বন্ধে বই ভালভাবে পড়ি। আর পড়ি হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে বই। কোরাণ পড়ি, ইংরেজী অনুবাদে অনেক পরে ১৯৩০ সালে জেলে। হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র সংস্কৃতে লিখিত। মূল পড়তে হলে সংস্কৃতে জ্ঞান দরকার। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় সংস্কৃত আবশ্যিক বিষয় ছিল। স্কুলে উপরের চার শ্রেণীতে সংস্কৃত পড়ান হত। কিন্তু স্কুলে সংস্কৃত পড়ার দিকে কোন আকর্ষণই হয়নি। জানি না কেন, এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে যখন বাড়ীতে ছিলাম তখন সংস্কৃত পড়ার দিকে একটা বিশেষ

ঝোঁক হয়। একে ভগবানের অনুগ্রহ ভিন্ন আর কি বলব। ক্রমে সংস্কৃতে ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন, অর্থশাস্ত্র, বিজ্ঞান প্রভৃতি সব বিষয়ের বই পড়ি। মনে হয় সংস্কৃত একটি সহজ ও উন্নত ভাষা। ভাস্করাচার্যের (দ্বাদশ শতাব্দী) 'সিদ্ধান্ত শিরোমণির' লীলাবতী অংশ পড়ে মুগ্ধ হই। নিউটনের (১৭শ শতাব্দী) পূর্বে তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ। কিছু কিছু সংস্কৃত পণ্ডিতের সংস্পর্শেও এসেছি। এঁদের মধ্যে সুরাট জিলার মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীপাদ দামোদর সাতভালেকারকে হিন্দুশাস্ত্র ও বেদের সবচেয়ে বড় পণ্ডিত মনে হয়েছে। আর বাংলার মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য যেরূপ সহজ সরল সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা দেন তা শুনে মনে হয় তিনি একজন উঁচুদরের পণ্ডিত। আজ ভারতের কোথাও সংস্কৃত কথ্যভাষা নেই। তাই মনে করতাম সংস্কৃতকে জাতীয় ভাষা করা যায় না। কিন্তু শেষোক্ত পণ্ডিতের বক্তৃতা শুনে মনে হল সংস্কৃতকে জাতীয় ভাষা করার দাবী সর্বাগ্রগণ্য। কারণ এটি অতি সহজ সরল ভাষা এবং ভারতীয় সভ্যতায় এর বিশেষ স্থান। আজ পরিণত বয়সে মনে করি উত্তর ও দক্ষিণ ভারত দুই অংশের পক্ষেই এতে ভাল হবে। আর হিন্দী তেমন সমৃদ্ধিশালী ভাষাও নয়। ইজরায়েলে যেভাবে জার্মান ইহুদী অধ্যাপক হিব্রু ভাষায় আণবিক বিজ্ঞান পড়াচ্ছেন তা দেখে সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করা উচিত এ মত দৃঢ় হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বাধীনতা লাভের পর 'নয়া ইংরেজ' হওয়ার প্রবণতা বেশ বেড়েছে। ভগবান আমাদের এই ব্যাধি মুক্ত করুন এই প্রার্থনা। উপরি উক্ত দুই পণ্ডিতের কেউ আজ জীবিত নেই। উভয়েই পরিণত বয়সে মারা গিয়েছেন। পণ্ডিত সাতভালেকার ত শতায়ু হয়েছিলেন। এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ।

প্রথম বেলুড় মঠে যাই ১৯১৩ সালে। স্বামী প্রেমানন্দের স্নেহ ও ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহার আমার হৃদয় স্পর্শ করে।

এরপর ১৯১৪-১৫ সালে তিনি ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ (মঠের প্রেসিডেণ্ট) ঢাকা আসেন। তখন প্রতিদিন যেতাম এঁদের কাছে। নিবিষ্ট মনে শুনতাম তাঁদের কথা। ফলে স্বামী প্রেমানন্দের উপর শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। একদিন তাঁকে অনুরোধ করি আমাকে দীক্ষা দিতে। স্বামীজীর (স্বামী বিবেকানন্দের) নির্দেশে তিনি কাউকে দীক্ষা দেন না বলে আমাকে রাখাল মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) কাছে দীক্ষা নিতে বলেন। এ প্রস্তাব আমার প্রাণে তেমন সাড়া জাগায় না। এর অর্থ এই নয় যে, আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামী প্রেমানন্দের মত উন্নত নন বা আমাকে দীক্ষা দেওয়ার অনুপযুক্ত। একজন কি করে আর একজনের মনকে আকর্ষণ করে তা এখনও অজ্ঞাত। স্বামী প্রেমানন্দের প্রস্তাব মত কাজ করতে না পারলেও তাঁর স্নেহভালবাসা চিরদিন পেয়েছি, আমিও তাঁকে চিরদিন শ্রদ্ধা করেছি। দুঃখের বিষয় ১৯১৮ সালে কালাজ্বরে তাঁর দেহত্যাগ হয়। তাই বেশী দিন তাঁর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য হয়নি। ঠাকুর রামকৃষ্ণ শিষ্যদের মধ্যে ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ, শিবানন্দ, তুরীয়ানন্দ, সারদানন্দ, সুবোধানন্দ ও অভেদানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের ও আলাপের সৌভাগ্য হয়েছে। এপর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশনের দশজন প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ, শুদ্ধানন্দ, শঙ্করানন্দ, মাধবানন্দ ও বীরেশ্বরানন্দর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু এঁদের মধ্যে কে ধর্মজগতে সবচেয়ে বেশী উন্নত তা বলবার অধিকারী আমি মোটেই নই। তবে পাণ্ডিত্যের দিক দিয়ে স্বামী শুদ্ধানন্দ সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। সে জ্ঞানে উত্তাপ ছিল না। ছিল প্রশান্ত স্নিগ্ধতা। আর দেখা করতে গেলে স্বামী শঙ্করানন্দ অন্ততঃ আধ ঘণ্টাখানেক ধর্মালোচনা করতেন। তা আমার পরম সৌভাগ্য।

১৯১৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে আমার জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে। ১৩ তারিখে গিয়েছি মিশনের 'উদ্বোধন' অফিসে। স্বামী সারদানন্দ ব্রহ্মচারী গণেন মহারাজকে বলেন—"প্রফুল্লকে

শ্রীমার (সারদা দেবীর) কাছে নিয়ে যাও।" দোতলায় গিয়ে শ্রীমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেন। সে কল্যাণময় হাতের স্পর্শ আজও অনুভব করি। কিন্তু তাঁকেও গুরু করিনি। অবশ্য সদ্‌গুরু লাভের ইচ্ছা ছিল বরাবরই। কোন গুরু পাইনি দীর্ঘকাল। সাধনার আগ্রহে ১৯৬০ সালে দ্বিতীয়বার কেদারবদরীধামে যাই। ২৪শে মে রাত্রিতে কেদার হতে কয়েক মাইল দূরে এক ধর্মশালায় শুয়ে আছি, স্বপ্নে দেখি আদি শঙ্করাচার্যকে। তিনি আমাকে মন্ত্র দিলেন। এর বিশেষ কোন অর্থ নাও থাকতে পারে। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে, এই মন্ত্র জপ করলে মন উন্নত হয়। জীবনে আর কখনো শঙ্করাচার্যকে স্বপ্নে দেখিনি। সারাজীবনেই আমি স্বপ্ন দেখেছি খুব কম। আমার ঘুম অতি গভীর।

শঙ্করাচার্যের মত প্রতিভা জগতে বিরল। তাঁর মধ্যে ছিল জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও সংগঠন শক্তির অপূর্ব সমন্বয়। ধর্মজগতে তাঁর দান ভারতে সব শিক্ষিত লোকেই কম-বেশী জানে। কিন্তু খুব কমলোকেই জানে যে, ঐতিহাসিক যুগে তিনি প্রথম প্রেম ও ধর্মভিত্তিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা। ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তির শেষ অংশ 'মা গৃধঃ কস্যসিদ্ ধনম্'—কারো ধনে লোভ করো না। শঙ্করাচার্য কস্যসিদ্ কথার অর্থ করেছেন 'স্বস্য বা পরস্য'—নিজের বা পরের। তাঁর মতে অর্থ হল নিজের বা পরের কারো ধনে লোভ করো না। এই হল সমাজতন্ত্রের আসল কথা। আধুনিক যুগে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ এই মত প্রচার করেন। তার পরিপূর্ণ রূপ দেন মহাত্মা গান্ধী—যা অছিবাদ নামে সুপরিচিত। তোমার নিজের ধন বলে যা মনে কর তাও তোমার নয়—ভগবানের। তুমি সেই ধনের অছিমাত্র। নিতান্ত যা প্রয়োজন তা নিজের জন্য খরচ করে বাকী সব ভগবানকে ফিরিয়ে দেবে অর্থাৎ সমাজকল্যাণে খরচ করবে। এই খাঁটি সমাজতন্ত্র ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রের

চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতে তা এখনো কার্যকরী হয়নি।

শঙ্করাচার্য অদ্বৈতমতের প্রতিষ্ঠাতা কিন্তু তাঁর উপাসনা শব্দের ব্যাখ্যা উত্তম সাকার উপাসকের প্রাণের কথা। তা এই :—"উপাসনম্ নাম যথাশাস্ত্রম্ উপাস্যস্য অর্থস্য বিষয়ীকরণেন সামীপ্যম্ উপগম্য তৈলধারাবৎ সমান প্রত্যয় প্রবাহেন দীর্ঘকালম্ যদ্ আসনম্ তদ্ উপাসনম্ আচক্ষতে।"

সাধুসঙ্গ, শাস্ত্রপাঠ, প্রার্থনা বা ধ্যান-ধারণা এবং তীর্থস্থান ও মহাপুরুষদের জন্মস্থান দর্শন ধর্মজীবন লাভের সহায়ক। সুযোগ পেলেই সাধুদর্শন করতাম, শাস্ত্রও নিয়মিত পড়তাম। ধ্যানধারণা আরম্ভ করি ১৯০৭ সালে—নিয়মিতভাবে ১৯০৯ সাল হতে। কিন্তু যোগসাধনে সবচেয়ে বেশী সাহায্য পাই মহর্ষি পতঞ্জলির যোগ-শাস্ত্র হতে। এমন বৈজ্ঞানিক উদার ও অতিবাস্তব বই যোগ সম্বন্ধে আর নেই। এই বই পড়ে এবং জীবনে খানিকটা অনুসরণ করে বুঝেছি যে, যোগটা নাক টেপাটেপি নয় বা বন্ধ্যার পুত্রলাভ ইত্যাদির জন্যও নয়—মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য। সাধন পথে সিদ্ধিলাভের জন্য বিভিন্ন উপায়ের কথা বলে শেষ কথা বলেছেন—'যথাভিমত ধ্যনাদ্বা'—যা অভিরুচি সেইরূপ ধ্যানের দ্বারাও হয়। তবে সব পথেরই আসল কথা প্রাণের আবেগ। তীব্র আবেগ হলে শীঘ্র লাভ হয় এ শাশ্বত সত্য।

ভারত ও ভারতের বাইরে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, খৃষ্ট, ইসলাম, ইহুদী প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র বহুস্থান দেখেছি। ভারতে দেখেছি কেদার-বদরী, কন্যাকুমারিকা, দ্বারকা, প্রভাস, পুরী, গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যা, উজ্জয়িনী, নাসিক, পুষ্কর, প্রয়াগে কুম্ভমেলা, কাঞ্চি, মাদুরা, বিজয়ওয়াদা, বুদ্ধগয়া, সারনাথ, কামাখ্যা, চন্দ্রনাথ, জম্মুতে রামের মন্দির, গঙ্গাসাগরসঙ্গমে কপিল-মুনির আশ্রম, পাভাপুরী, রাজস্থানে জৈনদের বিখ্যাত দিলওয়াড়া ও

রণকপুরের মন্দির, অজন্তা, ইলোরা, নাগার্জুনীকোণ্ডা, অমৃতসরে শিখদের স্বর্ণমন্দির, দিল্লীর জুম্মা মসজিদ ও আজমীঢ় শরিফ। করেছি প্রয়াগে কুম্ভস্নান ও পৌষ সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে গঙ্গাস্নান। সম্প্রতি ১৯৭৫ সালে দেখেছি দক্ষিণ ভারতে তিরুপতি বালাজী ভেঙ্কটেশ্বর। লক্ষ্মীনারায়ণের যুগলমূর্তি। পরম আনন্দদায়ক। কলাবাইয়ে কাঞ্চীর অবসর নেওয়া বৃদ্ধ শঙ্করাচার্য ও গদীতে আসীন শঙ্করাচার্য উভয়ের প্রাণভরা আশীর্বাদ ও প্রত্যেকের আধঘণ্টা করে আলাপ-আলোচনা আমার জীবনের পরম সৌভাগ্য। এইবার দক্ষিণ ভারত ঘুরে বুঝে এলাম দক্ষিণ ভারতই ভারতীয় কৃষ্টি বজায় রেখেছে।

নেপালে দেখেছি পশুপতিনাথের মন্দির ও বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী উদ্যান। ইজরায়েলে দেখেছি যীশুখৃষ্টের জন্মস্থান ও তাঁর সমাধির উপর তৈরী পবিত্র গীর্জা, ইহুদীদের প্রার্থনা স্থান সিনাগগ। জেরুজেলাম হতে অদূরে দেখেছি খলিফা ওমরের বিখ্যাত মসজিদ। কিন্তু ইজরায়েল হতে সেখানে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া যায় না। তাই সেখানে গিয়ে মসজিদ ভাল করে দেখবার সুযোগ পাইনি। দেখেছি শঙ্করাচার্যের জন্মস্থান কালাডি (কেরালা), চৈতন্যদেবের জন্মস্থান মায়াপুর-নবদ্বীপ (নদীয়া), রামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থান কামারপুকুর (হুগলী), সারদাদেবীর জন্মস্থান জয়রামবাটি (বাঁকুড়া), স্বামী বিবেকানন্দের জন্মস্থান ৩নং গৌরমোহন মুখার্জি রোড, কলকাতা, শ্রীঅরবিন্দের জন্মস্থান ৮নং থিয়েটার রোড, কলকাতা। অবশ্য এই তাঁর জন্মস্থান কি না তা নিশ্চিত নয়। আর দেখেছি মহাত্মাজীর জন্মস্থান পোরবন্দর (গুজরাট)। যত মন্দির দেখেছি তার মধ্যে দ্বারকার শ্রীনাথজীর মন্দিরের মূর্তি আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে। সারনাথের পরিনির্বাণ বুদ্ধমূর্তি শিল্পজগতে এক অপূর্ব সৃষ্টি। ইলোরার কৈলাসনাথের মন্দির জগতে এক আশ্চর্য জিনিস।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে ধর্ম সংকীর্ণতা কখনো আমার মনে

স্থান পায়নি। তাঁরই প্রভাবে জীবনে ধন সম্পদ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কখনো প্রার্থনা করিনি। প্রার্থনা করেছি ভগবানে যেন মতি থাকে এবং জনগণের সেবা যেন ঠিক ঠিক করতে পারি। কিন্তু এক বিষয়ে প্রথম দিকে আমার প্রচণ্ড ভুল ধারণা ছিল। আমি মনে করতাম স্বামীজীর প্রচারের জোরেই রামকৃষ্ণদেবকে সাধারণ লোক এত বড় বলে মনে করে। বেশ কিছু পরে বুঝি এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। স্বামীজী উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য বর্তমানে এই আমার দৃঢ় প্রতীতি। বর্তমানে আমি মনে করি রামকৃষ্ণদেব অবতার। ১৯৭৪-৭৫ সালে দুইবার তাঁকে স্বপ্নে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। তাঁর মুখের কথাও শুনেছি। বুঝেছি ঠাকুরের আমার উপর অপরিসীম অনুগ্রহ।

১৯১৩ সালে ঢাকা কলেজ হতে রসায়ন বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বি, এ, পাশ করি। স্নাতকোত্তর বৃত্তিও পাই। কিন্তু বি, এ, ও বি, এস্-সি-তে রসায়নে অনার্স প্রাপ্ত ছাত্রদের মধ্যে প্রথম বা দ্বিতীয় হইনি। ১৯১৫ সালে আমার ছাত্রজীবন শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। পরীক্ষা দিতে কলকাতায় এসে টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হওয়ায় পরীক্ষা দিতে পরিনি। এই অসুখের সময় ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত কোন ফি না নিয়ে আমার চিকিৎসা করেন। এ জন্য তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। দুঃখের বিষয় তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই। আমার ছাত্রজীবন শেষ হয় ১৯১৬ সালে। এই শেষ পরীক্ষায়ই জীবনের সবচেয়ে ভাল ফল করি। এম, এ,-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ত হই-ই এমনকি এম, এ, ও এম, এস-সি-তে রসায়নে পাশ ছাত্রের মধ্যে প্রথম হই। এখানে একটা কথা বলে রাখতে চাই যে, ছাত্রজীবনে আমি রাত জেগে পড়িনি। এর ব্যতিক্রম সারা জীবনে মাত্র দিন পনের। দিন কয়েক সরকার-নিষিদ্ধ বই পড়ে তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য, আর একবার স্কুল বদলী করার

পর পিছিয়ে পড়া পাঠক্রম পড়ে নিতে। ১৯১৩-১৪ সালে প্রথম বাড়ীর বাইরের রোগীর সেবা করি। ঢাকা কলেজ হোষ্টেলে জলবসন্ত হয়। রোগীদিগকে আলাদা করে রাখে। সেখানে গিয়ে তাদের সেবা করতাম। ফলে আমারও জলবসন্ত হয়। দুবার জীবনে এই রোগে ভুগেছি। কিন্তু এটা বেশী কষ্টদায়ক রোগ নয়। ১৯১৫ সালে প্রথম রিলিফের কাজ করি ত্রিপুরা জিলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমায়। আমাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল সাতগাঁ।

১৯১৪ সালের গোড়ায় মা তাঁর পছন্দমত একটি মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব করেন। আমি বিয়ে করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করি। মা কান্নাকাটি আরম্ভ করেন। একদিন তাঁকে বুঝিয়ে বলি—"মা তুমি কাঁদলে যে আমার অকল্যাণ হবে। আর মা, তুমি ত আমার সুখ চাও। বিয়ে না করেই আমি সুখী হবো। আমাকে আশীর্বাদ কর যেন চিরদিন সুখী হই।" এই কথা শুনে মা কান্না বন্ধ করলেন। এরপর তিনি আর কখনো কান্নাকাটি করেননি। এমন মা পাওয়া সৌভাগ্য। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এর মাত্র দেড় বছর পরে ১৯১৫ সালে কলেরা রোগে 'মা'র অকালমৃত্যু হয়। এই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখজনক ঘটনা। এরপর ১৯৩৬ সালে দ্বিতীয়বার আমার বিয়ের প্রস্তাব আসে এক ইংরেজ মহিলার তরফ হতে মহাত্মাজীর মারফতে। বিয়ে না করে যেন পবিত্র জীবন যাপন করতে পারি সেই আশীর্বাদ চাই মহাত্মাজীর কাছে। তা পাই। সাধুসঙ্গ, শাস্ত্রপাঠ, ধ্যানধারণা, তীর্থদর্শন, মহাপুরুষের আশীর্বাদ সত্ত্বেও এরপর দুইবার আমার বিয়ের কথা মনে আসে। বুঝলাম এ-পথ সহজ নয়। ইন্দ্রিয়গণ সচেষ্ট পুরুষের মনকেও বলপূর্বক আকর্ষণ করে গীতার এ-কথা যে কত সত্য তা বুঝলাম।

১৯১৬ সালেই ঢাকা কলেজে বাংলা সরকারের রসায়নে গবেষণায়

মাসিক ১০০ টাকার বৃত্তি পাই। এর পূর্বে ও পরে আমার কয়েকটি গবেষণা প্রবন্ধ লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির পত্রিকায় বেরোয়। ১৯১৯ সালে জানুয়ারী মাসে মাসিক ২০০ টাকা বেতনে প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রাদেশিক এডুকেশন সার্ভিসে রসায়ন বিজ্ঞানে ডিমনষ্ট্রেটার পদে নিযুক্ত হই। এখানে আমার মুখ্য কাজ ছিল এম. এস-সি. ছাত্রদের জৈব রসায়নে প্র্যাকটিক্যাল কাজ পরিচালনা এবং বি. এস-সি.-র রসায়নে অনার্স ছাত্রদের জৈব রসায়ন পড়ান ও প্র্যাকটিক্যাল পরিচালনা করা। এই ছাত্রদের ও সঙ্গী অধ্যাপকদের কাছে পেয়েছি মধুর ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার। দুঃখের বিষয় এঁদের অধিকাংশ আজ আর জীবিত নেই। নিয়ম অনুযায়ী এম. এ. পাশ করার পর তিন বৎসর অতীত হলে ১৯১৯ সালে পূজার ঠিক পরেই ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য গবেষণা-প্রবন্ধাদি পাঠাই। ১৯২০ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে পরীক্ষকদের কাছ থেকে জানতে পারি যে, আমার গবেষণা ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য অনুমোদিত হয়েছে। এম. এ. হলে পি. এইচ. ডি. আর এম. এস-সি. হলে ডি. এস-সি.। একটু নিম্নস্তরের গবেষণার জন্য এম. এস-সি.-দের পি. এইচ. ডি. দেওয়ার ব্যবস্থা তখন চালু হয়নি। কিন্তু তখন আর আমি প্রেসিডেন্সী কলেজে নেই। ১৯২০ সালে জানুয়ারী মাসে ডক্টরেট ডিগ্রী পাওয়ার পূর্বে আমি কলকাতা টাঁকশালে ডেপুটি-য়্যাসে মাষ্টার পদে নিযুক্ত হই। এ পদে আমিই প্রথম ভারতবাসী। ১৯২১ সালে জানুয়ারী মাসে এ পদ ছেড়ে দিয়ে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিই। তখন মাইনে ছিল মাসিক ৫০০ টাকা। এ ছাড়াও পুলিশের ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুলে মাসিক ৪টি বক্তৃতা দিয়ে পেতাম ১০০ টাকা। টাঁকশালে ইংরেজ অফিসারদের কাছেও পেয়েছিলাম প্রীতি ও হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার।

মহাত্মা গান্ধীকে প্রথম দেখি ১৯১৭ সালে কলকাতা

কংগ্রেসে। তারপর ১৯২০ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে। কিন্তু মনের উপর তেমন প্রভাব পড়ে না। ১৯২০ সালে ডিসেম্বরে তাঁর ঢাকার বক্তৃতার এক রিপোর্ট পাই। তাতে ছিল—"আপনারা বলেন ভগবান রাজাকে রক্ষা করুন, আমাদের দয়ালু রাজা দীর্ঘজীবী হোন।' এর অর্থ কি? ইহা ব্যক্তি হিসাবে রাজাকে বুঝায় না। এর অর্থ বৃটিশ সাম্রাজ্য চলতে থাকুক। কিন্তু আমার দিনরাতের প্রর্থনা এই যে, বৃটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হোক বা পরিশুদ্ধ হোক। একজন ইংরেজ হিসাবে জর্জ দীর্ঘজীবী হোন।" এই বক্তৃতা আমাকে অনুপ্রাণিত করে। ঢাকা হতে কলকাতায় আসার পরের দিন মহাত্মাজীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার। তাঁর পার্টিতে একজন পরিচিত লোক ছিল বলেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভব হয়। আলাপের ফলে বুঝলাম একজন অহিংস-পন্থী নির্ভীক হতে পারে। আর মনে হল এক বছরে স্বরাজলাভ না হলেও এ পথে দেশ অনেকদূর এগিয়ে যাবে স্বাধীনতার দিকে। তাই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়া মনে মনে স্থির করি। খুব স্নেহপূর্ণ ব্যবহার পাই মহাত্মাজীর কাছে। বিদায়ের সময় বললেন—"আমার অভিন্ন হৃদয় মহাদেবকে লিখো।" মহাদেব ভাই সত্যিই মহাত্মাজীর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত যোগ্য সেক্রেটারী। এই সাক্ষাতের সারা সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। ক্রমে তাঁর সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়। তাঁর সঙ্গে ঠিক হয়েছিল যে, তিনি মহাত্মাজীর জীবনী লিখবেন এবং আমি তার বাংলা অনুবাদ করব। দুঃখের বিষয় এই যে, সে বই লিখবার পূর্বেই ১৯৪২ সালে ১৫ই আগষ্ট তিনি মাত্র ৫০ বৎসর বয়সে আগা খাঁ প্রাসাদে বন্দী অবস্থায় মারা যান। দেশ হারাল একজন খাঁটি অহিংস সেবক, মহাত্মাজী হারালেন তাঁর ডান হাত, আমি হারালাম একজন অকৃত্রিম বন্ধু।

১৯২১ সালের ৩রা জানুয়ারী আমাদের অনামী সংঘের প্রায় সবাই একত্র হয়ে স্থির করি মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত

আন্দোলনে যোগ দেওয়া হবে। সভায় একথা স্পষ্ট বলা হয়েছিল যে, যার প্রাণে সাড়া জাগবে তারই আন্দোলনে যোগ দেওয়া উচিত—অন্য কারো নয়। সুরেশদা এই সভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি। তিন দিন পর তিনি এসে প্রথমে আমাদের অনামী সংঘের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আবাসিক কলেজ করার উপর জোর দেন। বিশদভাবে আলোচনার পর তিনিও আন্দোলনে যোগ দেওয়া সমর্থন করেন। এরপর আমি ১২ই জানুয়ারী চাকুরী হতে ইস্তফা দেই এবং ১৩ই জানুয়ারী তারিখে তা গৃহীত হয়। চাকুরীর সময় দুবছরই ছিলাম অনামী সংঘের কলকাতা কেন্দ্র ৯নং বাদুড় বাগান রো'তে। বাবা তখন এখানে। তাঁকে সব কথা খুলে বলি। তিনি বলেন—"আমার জন্য চিন্তা করো না। প্রয়োজন হলে রোজগার করে খাবো। আসল কথা স্বাধীনতালাভ। পারবে কি তা করতে?" "প্রাণপণ চেষ্টা করব"—বললাম। বাবার আশীর্বাদ পেলাম। এরূপ বাবার সন্তান হওয়াও মহাভাগ্যের কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার চাকরী ছাড়ার ৮ দিনের মধ্যেই তাঁর দেহত্যাগ হয় নিউমোনিয়া রোগে। বাদুড় বাগান রো'র বাসায় আমরা থাকতাম দশজন। ১৯১৯ সালে টাকার অভাবে আমাদের সুষম খাদ্য জুটত না। মাসিক ওষুধের খরচ ছিল ৩৫—৪০ টাকা। ১৯২০ সালে মাসিক খাওয়া-খরচ ৫০ টাকা বাড়াতে পারি। তখন ওষুধের খরচ শেষে কমে আসে মাসিক ৪—৫ টাকায়। হাড়ে হাড়ে বুঝলাম জাতির প্রথম প্রয়োজন নিম্নতম সুষম খাদ্য। তাই সারাজীবনই মনে করেছি যে, জাতির সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা না করে বড় বড় হাসপাতাল করা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও সমাজসেবার নামে প্রহসন। স্বাধীনতা লাভের ২৮ বছর পরেও দেশের আজ শতকরা ৯৮ জনের বেশী নিম্নতম সুষম খাদ্য পায় না। শুধু এই নয়, আজ দেশে এমন খুব কম হাসপাতাল আছে যেখানে অসহায় রোগীদের খাওয়ার এক অংশ ইঁদুরের গর্ত দিয়ে চলে যায় না।

১৯১৯ সালে একদিন খাদ্যে বিষক্রিয়ায় এই বাসায় আমরা অনেকে অসুস্থ হই। ডাঃ অমূল্য উকিল ও ডাঃ হেমেন ঘোষের চিকিৎসায় ও উত্তম সেবা শুশ্রূষায় সবাই সুস্থ হয়ে ওঠি।

চাকরী ছেড়ে দিয়ে প্রথম আশীর্বাদ নিতে যাই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কাছে। চাকরী ছেড়ে দিয়ে অসহযোগ অন্দোলনে যোগ দেওয়া স্থির করেছি শুনে প্রথম তিনি একটু অবাক হয়ে যান। পরে বলেন—"বিজ্ঞানের সঙ্গে যে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। তাতে দেশের ক্ষতি হবে।" আমি বলি—"দেশ স্বাধীন হলে বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি হবে।" এ কথার সঙ্গে তিনি একমত হন এবং আমাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে আশীর্বাদ করেন। কিন্তু আমাদের এআশা মোটেই ফলবতী হয়নি। ইংরেজ শাসনের আমলে ১৪ জন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী হয়েছিলেন দেশে। কিন্তু স্বাধীনোত্তর ভারতে সেরূপ একজনও হননি। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী হরগোবিন্দ খোরানা জন্মেছিলেন ভারতে। কিন্তু বিদেশে কাজ করে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পূর্বে কোন স্বীকৃতি পাননি এ দেশে। অথচ বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বর্তমান ভারত সরকার ইংরেজ সরকারের বহুগুণ টাকা খরচ করে। ১৯৬৯ সালে একদিন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী বন্ধুবর অধ্যাপক সত্যেন বোসকে জিজ্ঞাসা করি এর কারণ কি? উত্তরে সত্যেন বলে—"ভাই, তাড়াতাড়ি স্বাধীনতা এনে তোমরাও যা করেছ আমরাও তাই করেছি।" একমাত্র ভারতেই কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা না করেও জওহরলাল নেহেরু ও বিধানচন্দ্র রায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন। দুঃখের বিষয় আচার্য রায় স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই (১৬ই জুন, ১৯৪৪) এবং সত্যেনও সম্প্রতি (৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪) চলে গিয়েছেন আমাদের মধ্য হতে। আছে মধুর স্মৃতিটুকু। আচার্য রায়ের ছাত্র আমি ছিলাম না, কিন্তু তাঁকে গুরুর মতই শ্রদ্ধা করি, তিনিও আমাকে ছাত্রের মত স্নেহ করে এসেছেন। আচর্যদেবের

কর্মক্ষেত্র ছিল বহুমুখী। সবদিক দিয়ে বিচার করলে তাঁর মত লোক ভারতে বিরল। ভারতে যে ১৫ জন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ৫ জন বাঙ্গালী, ৫ জন মাদ্রাজ প্রদেশের, ৩ জন পাঞ্জাবী ও ২ জন বোম্বের পার্শী। হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চল হতে একজনও হননি, শুধু তাই নয়, গত একশ' বছরের মধ্যে ঐ অঞ্চল হতে প্রতিভাবান্ মৌলিক অবদানকারী কোন ব্যক্তি কি রাজনীতি, কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান কোন ক্ষেত্রেই হননি।

অনামী সংঘের আমরা যে কয়জন গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনে যোগ দেওয়া স্থির করি তারা এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সেই কাজে ব্রতী হতে চাই। নাগপুর কংগ্রেসের পর ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর প্রচুর আয়ের আইন ব্যবসা ত্যাগ করেন। এজন্য গুণগ্রাহীরা তাঁকে "দেশবন্ধু" আখ্যা দেন। তিনি চেয়েছিলেন আমি গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন বা জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ হই। কিন্তু আমরা কলকাতায় না থেকে কোন এক মফঃস্বল শহরে গিয়ে গ্রামের মধ্যে কাজ করতে চাই। দেশবন্ধু তা পছন্দ করেন। আশ্রমের মূলনীতি ও নিয়মের খসড়া করে দেশবন্ধুর বাড়ীতে মহাত্মাজীর সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ করি। তিনিই আশ্রমের নাম রাখেন 'অভয় আশ্রম'। আমরা আশ্রমের মূলনীতি সম্বন্ধে লিখেছিলাম—'দেশসেবার ভিতর দিয়ে আত্মোপলব্ধি'। মহাত্মাজী তার সঙ্গে জুড়ে দিলেন—'মাতৃভূমির সেবা—অর্থ সত্য ও ভগবানের সেবা এবং অন্য কারো কোন অনিষ্ট না করা।' সমস্ত মানব জাতির উপর প্রেম এবং সত্য, ভগবদ্ নিষ্ঠা ভিন্ন যে দেশসেবা সে দেশসেবার প্রহসন মাত্র। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ঃ—

"জাতিপ্রেম নামধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চায় বলের বন্যায়।"

তা হতে মুক্ত করার ইচ্ছায় এই অংশ জুড়ে দিয়ে মহাত্মাজী

আমাদের পরম উপকার করেছেন। আর যেভাবে তিনি আমাদের সম্বন্ধে খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করলেন তাতে মনে হল তিনি আমাদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী এবং বুঝলাম তাঁর মন অতি উদার।

এগার জন সভ্য ও কয়েকজন কর্মী নিয়ে ঢাকায় এক ভাড়া বাড়ীতে অভয় আশ্রমের কাজ শুরু হয়। সভাপতি ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সুরেশদা) ও সম্পাদক আমি। এগারজন সভ্যের মধ্যে দশজনই আজীবন দেশসেবী হন। দুঃখের বিষয় তাঁদের মধ্যে ছজনই আজ জীবিত নেই। এঁদের মধ্যে সুরেশদাই একমাত্র ছিলেন আমার চেয়ে চার বছরের বড় আর সবাই ছোট। বয়সে ছোট সহকর্মী মারা গেলে দুঃখ হয় বেশী। দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার এই এক শাস্তি।

সুরেশদা ছিলেন ত্যাগী ও ভাবপ্রবণ। শারীরিক অসুবিধা অগ্রাহ্য করেও কাজ করতেন। প্রথম জীবনে ধর্মের উচ্ছ্বাস খুব বেশী ছিল। কিন্তু এক সময় তাঁর ধর্মবিশ্বাস একপ্রকার ছিল না বললেই চলে। মৃত্যুর বছর দুয়েক পূর্বে তা ফিরে আসে। তাঁর হাতে টাকা থাকলে কেউ এসে ধরলে অমনিই তাকে কিছু দিয়ে দিতেন। ফলে পূর্বপ্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারতেন না। তিনি বই লিখেছেন কয়েকখানা; তার মধ্যে 'বুদ্ধচরিত' আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে।

সুরেশদার মত আরো দুজন অস্থায়ী ক্যাপ্টেন আই. এম. এস. ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত ও ডাঃ আশুতোষ দাস ঐ পদে ইস্তফা দিয়ে মহাত্মাজীর পথে রাজনৈতিক ও গঠনমূলক কাজ করেন। তাঁরা অভয় আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত না হলেও আমার সঙ্গে গভীর হৃদ্যতা ছিল। দুঃখের বিষয় তাঁরাও বেশ কিছুদিন হল আমাদের মধ্যে আর নেই।

কলকাতা হতে ঢাকা আসবার পূর্বে ১৯২১ সালে জানুয়ারী মাসেই কয়েকবার মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে তাঁকে আরো ভাল করে বুঝতে পারি। তিনি চাইতেন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক

ও সামাজিক অবিচার দূর করতে। তাঁর দৃষ্টি ছিল সামগ্রিক। তাঁর উদারতা, ভগবদ্ বিশ্বাস, সর্বপ্রকারের অন্যায়-অবিচার দূর করার দৃঢ় সংকল্প, সর্বোপরি জাতি-বর্ণ-ধর্ম-দেশ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি ভালবাসা আমাকে মুগ্ধ করে। ক্রমে তাঁর সকল প্রচেষ্টার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে বুঝি যে, তাঁর মত লোক জগতে বিরল! রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি এক মহান বিপ্লবী। যত মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কে এসেছি তাঁদের মধ্যে মহাত্মাজীকে শ্রেষ্ঠ বলে অনুভব করেছি। তিনি ছিলেন অহিংস সমাজবাদী—হিংসা ও সমাজবাদ পরস্পর-বিরোধী। এক সঙ্গে দুইয়ের সমাবেশ অসম্ভব। ইউরোপে আজ যে হিংসাশ্রয়ী সমাজতন্ত্র চলছে তা স্পষ্ট ভাষায় গুণ্ডাতন্ত্রের ধোপ-দুরস্ত সংস্করণ মাত্র। শুধু তাই নয় আজকের আণবিক যুগে সমস্ত মানবজাতির ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করবে। আর মহাত্মাজীর সমাজবাদে কোন ধোঁয়াটে জিনিস নেই। আছে কর্তব্য ও অধিকারের পরিপূর্ণ মিলন। তাঁর মতে প্রত্যেকে নিজ বুদ্ধি ও সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করবে, আর প্রত্যেক মানুষ পাবে :—(১) নিম্নতম সুষম খাদ্য, (২) নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্ত্র, (৩) স্বাস্থ্যকর বাসস্থান, (৪) অসুখ হলে সাধারণ রকমের চিকিৎসার ব্যবস্থা ও (৫) প্রত্যেকের ছেলেমেয়ের কতকদূর পর্যন্ত লেখাপড়ার সুযোগ। কংগ্রেসের সমাজতন্ত্র বা 'গরীবী হটাও'-এর মধ্যে স্পষ্ট কিছু বলা নেই। আছে ধোঁয়াটে ভাব। মহাত্মাজীর মতে এই দরিদ্র দেশে ভগবানকেও খাদ্যরূপে অবতীর্ণ হতে হবে। কিন্তু অন্ন বস্ত্র ইত্যাদিই সব নয়। সঙ্গে চাই ভগবদ্ বিশ্বাস ও মানবপ্রেম। তাঁর মতে অহিংসায় বিশ্বাসীর সমস্ত শক্তির উৎস ভগবান। তিনি বলতেন যে, ভগবদ্ বিশ্বাসী ভিন্ন কেউ সত্যাগ্রহ করতে পারে না। কিন্তু দেশ আজ গান্ধী প্রদর্শিত পথ হতে বহুদূরে চলে গিয়েছে। অবশ্য মুখে গান্ধীর নাম আছে। খানিকটা ঘটা করে তাঁর জন্মদিনও পালন করা হয়। এও প্রায় সার্বজনীন দুর্গাপূজার মত। এ জন্য

গান্ধীপন্থীদের দায়িত্ব সর্বাধিক। আমি নিজেকেও একজন গান্ধীপন্থী বলে মনে করি কাজেই আমারও দায়িত্ব রয়েছে। মনে হয় ভগবান যদি আরো শক্তি দিতেন। কিন্তু তার জন্যও আমার ক্ষোভ নেই। নিজের সাধ্যমত চেষ্টা করেছি, করবও। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যেন তা করে যেতে পারি।

আত্মিক শক্তির বলে স্বাধীনতা লাভের পথ মহাত্মাজী জগৎকে দেখান এবং মুখ্যতঃ সেই পথ অনুসরণ করে ভারতের স্বাধীনতা লাভের ফলে তাঁর প্রতি পাশ্চাত্যের মনীষীদের মধ্যে গভীর শ্রদ্ধা ও ভারতের প্রতি একটা মর্যাদাবোধ জন্মে। ১৯৫৩ সালে প্রিন্সটনে বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের ঘরে দেখলাম মহাত্মাজীর ছবি। বিজ্ঞানী বললেন—"তিনি (গান্ধী) এযুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ।" পরমাণু বিভাজনকারী বিজ্ঞানী অটোহান যখন জানলেন আমি মহাত্মাজীর সঙ্গে কাজ করেছি, অমনি বলে উঠলেন—"আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ আমার সৌভাগ্য।" রসায়নে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানী হাইনরিস ভিলাণ্ড আলাপের সময় বলেন—"আমি নেহেরুর বৈদেশিক নীতি পছন্দ করি। কিন্তু ভারত আজ যা, তা মুখ্যতঃ গান্ধীর জন্যই। আপনাদের প্রধান সমস্যা হল জনগণের মান উন্নত করা।" হামবুর্গের ভারতবিদ্যার অধ্যাপক লুডভিক আলসডর্ফ তাঁর 'গান্ধী ভারত আত্মার প্রতীক ও নব উন্মেষক' নামক জার্মান পুস্তিকায় লিখেছেন—"জনগণের সঙ্গে তাঁর (গান্ধীর) সত্যিকারের নিবিড় যোগাযোগ যা অন্য কারো পক্ষে সামান্য পরিমাণেও সম্ভব হয়নি।" অবশ্য আমার মতে বিবেকানন্দ, গান্ধী ও অরবিন্দ তিন জনই ভারত আত্মার প্রতীক ও নব উন্মেষক। মহাত্মাজীর দেহত্যাগের পর জেনারেল ম্যাকআর্থার বলেছিলেন যে, যদি জগৎকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা পেতে হয় তা বিরাট পরিমাণ অস্ত্রের শক্তি ব্যবহারের দ্বারা হবে না—হবে গান্ধীর পথে। এই প্রসঙ্গে লবণ সত্যাগ্রহ চলাকালে জার্মানীর মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিকুলগুরু

রবীন্দ্রনাথের উক্তি উল্লেখযোগ্য। কবির বক্তৃতার পর একজন জিজ্ঞাসা করেন—"গান্ধী কি তাঁর উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারবেন?" উত্তরে কবি বলেন—"সে কথা কে জানে! কিন্তু আমি যা জানি তা হচ্ছে এই :—

(১) "তিনি এক অঘটন ঘটিয়েছেন।

(২) তিনি আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন।

(৩) তিনি আমাদিগকে মর্যাদা দিয়েছেন।

(৪) তিনি আমাদিগকে উন্নত করেছেন।"

রবীন্দ্রনাথ আজ পর্যন্ত জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক-প্রতিভা। ১৯১৭ সালে তাঁর সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য হয়। শান্তিনিকেতনে গিয়ে কয়েকদিন ছিলাম। পাই কবির প্রাণের পরশ। বুঝি কত মহান তিনি। সেই সময়কার তাঁর একটা উক্তি চিরকাল মনে রাখবার মত। আলাপচ্ছলে বলেন—"অনেকে বই লিখে একটা কৈফিয়ৎ দেন যে, 'তাড়াতাড়িলিখতে হল বলে অনেক ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে, পাঠকরা তা ক্ষমা করবেন।' কে তাদের বইয়ের জন্য অপেক্ষা করে বসেছিল যে তাড়াতাড়ি লিখতে হল? প্রত্যেকের সাধ্যমত চেষ্টা করে তার পক্ষে যা সর্বোত্তম তাই ছাপান উচিত।" প্রত্যেক লেখকের একথা মনে রাখবার মত। এ কয়দিনে হৃদ্যতা হয় হিন্দীর সুলেখক পণ্ডিত বানারসী দাস চতুর্বেদীর সঙ্গে আর পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীকে খুব উঁচুদরের পণ্ডিত বলে মনে হয়। ভাল লাগে শান্তিনিকেতনকে। তাই এর প্রতি আমার প্রাণের টান বরাবর। এখন শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়। বড় বড় দালান কোঠা অনেক হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় ১৯১৭ সালের শান্তিনিকেতন এখনকার চেয়ে অনেক ভাল ছিল।

যত লোকের ব্যক্তিগত সম্পর্কে এসেছি তাঁদের মধ্যে মহাত্মাজীকে শ্রেষ্ঠ বলে অনুভব করলেও তাঁর কোন কথা নির্বিচারে গ্রহণ করিনি। মনবুদ্ধি যা সমর্থন করেছে তা-ই গ্রহণ করেছি।

যেখানে নিশ্চিত মনে হয়েছে তাঁর কথা বিচারসহ নয় তাঁকে গিয়ে স্পষ্ট বলেছি। তারপর তাঁর যুক্তিগুণেও যদি সে কথার যৌক্তিকতা উপলব্ধি না করেছি তবে তাঁকে সে কথা বলেছি এবং কার্যতঃ তা করিনি। যখন তাঁর কথা যুক্তিযুক্ত কিনা স্পষ্ট বুঝিনি তখন তাঁর মত অনুযায়ীই কাজ করেছি। অবশ্য এ কথা বলাই বাহুল্য যে, তাঁর মত ঠিক মনে করলে তা কার্যকরী করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এইভাবে কাজ করেছি বলে মহাত্মাজীর নিকটতর হতে পেরেছি এবং তাঁর স্নেহ ও ভালবাসা পেয়েছি অপরিসীম। আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পর আমরা কয়েকজন দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা করি। আলাপের প্রভাব আমার মনের উপর রেখাপাত করে। এরপর বাবার মৃত্যু হলে দেশবন্ধু নিজেই আমাকে ডেকে বলেন, "প্রফুল্ল, তোমার বাবার শ্রাদ্ধের জন্য যা প্রয়োজন তা আমার কাছ থেকে নিও।" বুঝলাম কত দরদী প্রাণ তাঁর! বাবার শ্রাদ্ধে খরচ করি ৭৫ টাকা। আমার তা ছিল। কাজেই দেশবন্ধুর কাছ থেকে টাকা নেইনি। যদিও তাঁর কাছ থেকে টাকা নিতে আমার কোন সঙ্কোচ ছিল না। জীবনে তিনজন লোকের কাছে নিঃসঙ্কোচে টাকা চাইতে পারতাম ঃ—(১) মহাত্মা গান্ধী, (২) দেশবন্ধু দাশ, (৩) আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। প্রথম দুজনের কাছে টাকা নিতে হয়নি। আচার্য রায়ের কাছ থেকে নিয়েছি এবং তিনিও দিয়েছেন খুব স্নেহ-ভালবাসা সহকারে। অবশ্য বহু লোক তাঁকে ঠকিয়েছে। একদিন কথা প্রসঙ্গে দেশবন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—"প্রফুল্ল, তোমাদের গুরুদেব (আচার্য রায়) এত নিরাশাবাদী কেন?" আমি বলি—"বহুলোক তাঁকে ঠকিয়েছে তাই বোধ হয়।" অমনি দেশবন্ধু বলেন—"প্রফুল্ল, আমাকে যত লোক ঠকিয়েছে তত লোক কি তাঁকে ঠকিয়েছে?"

১৯২১ সালে দেশবন্ধুর সঙ্গে যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক হয় রাজনৈতিক মতভেদ হলেও তা অটুট থাকে। আমরা একই জনসভায় কাউন্সিল

প্রবেশের পক্ষে ও বিপক্ষে নিজ নিজ বক্তব্য বলেছি। একদিন সভার পর ট্রাম ধর্মঘটের দরুণ আমাকে হেঁটে বাসায় যেতে হবে জেনে তাঁর গাড়ীতেই আমাকে পৌঁছে দিলেন। আজ এসব কল্পনাতীত। আমি সকলের সঙ্গেই ব্যক্তিগত সম্পর্ক মধুর রাখতে চেষ্টা করেছি। আমার ধারণা স্বার্থবুদ্ধিহীন মতভেদ অনেক সময় কল্যাণকর হয়। ১৯২৫ সালের জুন মাসে প্রথম সপ্তাহে দার্জিলিংয়ে মহাত্মাজী দেশবন্ধুকে তাঁর গ্রামোন্নয়ন কমিটিতে আমাকে একজন সভ্য করার কথা বললে দেশবন্ধু বলেন—"প্রফুল্ল কি আসবে? সে ত আজকাল আমার সঙ্গে দেখাই করে না।" এর ৩।৪ দিন পর সব কথা শুনে বলি—"আমি একবার কেন পঞ্চাশবার দেখা করতে প্রস্তুত।" আর বলি—"আজকাল তিনি শারীরিক কারণে তাঁর মত সমর্থন না করলে চটে যান। তাঁর মতে সব সময় সায় দেওয়াও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ চটে গেলে তাঁর শরীর আরো খারাপ হবে তাই দেখা করতে যাই না। তিনি কলকাতা ফিরে এলেই গিয়ে দেখা করব। দুঃখের বিষয় সে দেখা আর হল না। ১৭ই জুন তাঁর মৃতদেহ দেখলাম শিয়ালদহ স্টেশনে। দুঃখ রয়ে গেল চিরকাল। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে—৫৫ বছর বয়সে—চলে গেলেন তিনি। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ব্যারিষ্টারী ত্যাগ করেন, মদ খাওয়াও ছেড়ে দেন। এমন কি আর্থিক অসুবিধা সত্ত্বেও আর আইন ব্যবসায় ফিরে যাননি, মদ খাওয়াও আর ধরেননি। এজন্য তাঁকে বরাবরই শ্রদ্ধা করেছি। কিন্তু রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে 'তুমি ভণ্ড' তাঁর এই অশোভন উক্তি এবং বিধানসভায় ভোট পাওয়ার জন্য যে সব উপায় অবলম্বন করলেন তা কোনমতেই সমর্থন করা যায় না। উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয় উপায় যাই হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না এই ছিল দেশবন্ধুর নীতি। মহাত্মাজীর নীতি ছিল উদ্দেশ্য ও উপায় দুইই মহৎ এবং বিশুদ্ধ হওয়া চাই। আমার নিশ্চিত মত এই যে, মহাত্মাজীর পথ অনুসরণে জগতের সত্যিকারের কল্যাণ। এই পথ কষ্টকর; কিন্তু শ্রেয়ঃ।

কলকাতা হতে ঢাকা আসবার পূর্বে শ্রীঅরবিন্দের সহযোগী স্বদেশীযুগের অন্যতম নির্বাসিত নেতা শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়। চিরদিন তাঁর স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছি। তিনি ছিলেন সুলেখক, সুবক্তা, নির্ভীক আদর্শনিষ্ঠ ও আত্মভোলা দেশ-প্রেমিক। অবশ্য খানিকটা অগোছাল। ১৯৩২ সালে খানিকটা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে অপুষ্টিজনিত রোগে ৬৩ বছর বয়সে তাঁর দেহত্যাগ হয়। তাঁর মত দেশপ্রেমিকের এভাবে মৃত্যু বাংলাদেশের পক্ষে অগৌরবের ও লজ্জার। আর একজন বাংলার নির্বাসিত নেতা অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয় ১৯১৭ সালে বরিশালে। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনে বরিশাল ছিল শীর্ষস্থানে। এর মূলে অশ্বিনীবাবু ও তাঁর সহকর্মিগণ। আলাপ ও ব্যবহারে বুঝলাম একজন খাঁটি দেশভক্ত, ধর্মপ্রাণ ও ভারতীয় কৃষ্টির পতাকাবাহী। কলকাতায় তাঁর দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্বে ১৯২৩ সালে আলাপের সময় বুঝি কি স্নেহপ্রবণ প্রাণ তাঁর, কি হিতাকাঙ্ক্ষী সকলের। দুঃখ হয়েছিল খুবই তাঁর মৃত্যুতে।

অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে হলাম এক মহান বিপ্লবের পতাকাবাহী। নূতন পথের পথিক—এবার প্রস্তুতি আরম্ভ হল ঢাকা আশ্রমে। সকাল-সন্ধ্যায় সকলের সমবেত প্রার্থনা, ধর্মশাস্ত্র পাঠ, একটিও ইংরেজী শব্দ ব্যবহার না করে বাংলায় কথা বলা ও বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস করা, চরখায় সুতাকাটা, প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষা, কংগ্রেসের ইতিহাস, অসহযোগ আন্দোলন কেন, ভারতের অর্থনীতি ও দক্ষিণ আফ্রিকা সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে বই ভাল করে পড়ি। হিন্দী শিখতে আরম্ভ করি। খুবই ব্যস্ত জীবন ছিল। নিজেদের কাজ সব নিজেরাই করতাম। কোন সহায়ক ছিল না। খরচের মাত্রাও ছিল সীমিত। শহরে উর্ধ্বপক্ষে মাথাপিছু মাসিক ১৫ টাকা। আর গ্রামে ১০ টাকা। এইভাবে মাস দুই প্রস্তুতির পর গ্রামের কাজ আরম্ভ করি—প্রথম আমার জন্মগ্রাম মালিকান্দাকে কেন্দ্র করে।

ক্রমে আশ্রম কর্মীরা দোহার নবাবগঞ্জ, শ্রীনগর ও সিরাজদিখাঁ এই চার থানায় ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়টা ছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। একপ্রকার রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর জীবন। কাজ করতে করতে কারো বাড়ীতে স্নান-খাওয়ার ব্যবস্থা করতাম। ধনী, দরিদ্র, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল শ্রেণীর ও ধর্মের লোকের বাড়ীতে অতিথি হয়েছি। কিন্তু মাছ দুধ পাইনি এমন দিন মনে পড়ে না। এরপর উপরি-উক্ত চার থানা ও মুন্সীগঞ্জ মহকুমার আরো চারটি থানা নিয়ে গঠন করা হয় বিক্রমপুর মহকুমা কমিটি। অভয় আশ্রমের কর্মী ছাড়াও একদল কর্মী বিভিন্ন আশ্রম করে কাজ করেন এই মহকুমায়। জীবনে সবচেয়ে বেশী আনন্দ পেয়েছি এঁদের সঙ্গে কাজ করে। এঁদের মধ্যেও বেশ কয়েকজন আজ জীবিত নেই। জীবনে কখনো তাঁদের ভুলতে পারব না।

১৯৩১ সালে ঢাকা আশ্রমে আসেন দেশবন্ধু ও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। দেশবন্ধু ঢাকায় এলে আমরা তাঁকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসি। আশ্রমের সবাই উপস্থিত হয়েছিল তাঁর কথা শুনতে। আশ্রমের পক্ষ হতে সুরেশদা মহাত্মাজীর কার্যক্রমের কথা বলতে গিয়ে তাঁকে চৈতন্যদেবের সঙ্গে তুলনা করেন। মহাত্মাজী যেভাবে রাজনীতি, গঠনমূলক কাজ ও ধর্মের সমন্বয় করেছেন তার ভূয়সী প্রশংসা করেন দেশবন্ধু কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে তুলনা করা ঠিক মনে করেন না। দেশবন্ধুর কথা আমারও ঠিক মনে হয়। এখানে একটি কথা বলে রাখতে চাই যে, যদিও আমার ধর্মে মতি ছিল তথাপি ছোটবেলায় বৈষ্ণবধর্মের প্রতি একটা বীতশ্রদ্ধা হয় গ্রামের বৈরাগীর আখড়ার আচরণ দেখে। অনেক পরে বুঝি চৈতন্যদেবের প্রেম ও ভক্তির ধর্ম বাঙালীর প্রাণকেই নিঃশেষে ব্যক্ত করেছে। আচার্য জগদীশচন্দ্র ঢাকায় এসে অধ্যাপক ভূপতি সেনের বাসায় ছিলেন। তাঁর আসার খবর পেয়ে প্রবল ইচ্ছা হয় তাঁকে আশ্রমে নিয়ে আসার। একে ত ব্যক্তিগত পরিচয় নেই, তারপর

রাজনৈতিক কাজ করছি আমরা। আসবেন কিনা ভেবে ইতস্ততঃ করছি। ঠিক এমন সময় অধ্যাপক সেনের কাছ থেকে এই মর্মে চিঠি নিয়ে একজন লোক এল যে, আচার্য বসু আমাদের আশ্রমে আসতে চান এবং কখন এলে আমাদের সুবিধা হয়। আমি তৎক্ষণাৎ যাই আচার্যকে নিমন্ত্রণ করতে। তার পরের দিন তাঁর সুবিধামত সময়ে এলেন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সব দেখে কোন কোন বিষয়ে উন্নতিকল্পে মত দিলেন। এই আসা নিয়ে বুঝলাম তিনি শুধু একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী নন এক মহাপ্রাণ ব্যক্তি। এরপর কলকাতায় বোস ইনষ্টিটিউটে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। সব সময়ই পেয়েছি খুব স্নেহপূর্ণ ব্যবহার। দুঃখের বিষয় ১৯৩৭ সালে তিনি আমাদের মধ্যে থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলেন। আর একজন বিশিষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী অধ্যাপক রমণের সঙ্গে পরিচয়ের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তাঁর কাছ থেকেও বরাবরই খুব প্রীতি ও হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার পেয়েছি। তিনিই প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানী কলকাতায় গবেষণা করে নোবেল পুরস্কার পান। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। তাঁর সঙ্গে বহুবার দেখা হয়েছে। শেষ দেখা ১৯৬০ সালে ব্যাঙ্গালোরে। দুই ঘণ্টা ধরে রমণ ইনষ্টিটিউট দেখান। কথাচ্ছলে বলেন—"আপনি কি মনে করেন যে, আমিই একমাত্র ভারতীয় বিজ্ঞানী যিনি নোবেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য?" তিনি নিজেই উত্তর দেন—"নিশ্চিত নয়। একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিত গবেষণাগারের অতিরিক্ত বিজ্ঞান চর্চার জন্য ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনে আমাকে প্রচুর সুযোগ দিয়েছেন—এমনকি টাকা নষ্ট করারও। তাই ফল দেখাতে পেরেছি।" নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পূর্বে তিনি ইউরোপ যাননি। সে সম্বন্ধেও তিনি বলেন—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে আমার কেম্ব্রিজে গবেষণার জন্য সব ব্যবস্থা হয়। কেন যেন মনে হল যাই একবার স্যার

গুরুদাসকে জিজ্ঞাসা করি এ বিষয়ে। গেলাম, তিনি সব শুনে বললেন—"আপনি ভাল কাজ করছেন। হয়তো আরো ভাল কাজ করবেন। কিন্তু কেম্ব্রিজে গেলে সব সুনামই হবে সেখানকার। আর যদি না যান সবটা সুনামই হবে আপনার ও ভারতের। এই কথা শুনে যাওয়া বন্ধ করলাম।" অধ্যাপক রমণ ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক। ১৯৭৩ সালে একদিন আলাপের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত রসায়নের পালিত অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়ও বলেন যে, অধ্যাপক রমণ ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, আরো ভালো কাজ করে যখন তিনি নোবেল পুরস্কার পান তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে তাঁকে একটা অভ্যর্থনাও দেওয়া হয়নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এটা চিরকলঙ্ক। তখন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নন বটে, কিন্তু প্রায় সর্বেসর্বা। ডঃ মুখার্জীর এই আচরণে ব্যথিত হই। অথচ অধ্যাপক রমণ এফ. আর. এস. হওয়ার পর স্যার আশুতোষ বিজ্ঞান কলেজের প্রাঙ্গণে সামিয়ানা খাটিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। অবশ্য নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর বিজ্ঞান কলেজ হতে একটি অভ্যর্থনা দেওয়া হয়। সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। অধ্যাপক রমণ দেহ-ত্যাগ করেছেন ১৯৭০ সালে ২১শে নভেম্বর, ৮২ বছর বয়সে। পরিণত বয়সে গেলেন তবু তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে খুব ব্যথিত হই। দুইজন তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন বোস কলকাতায় গবেষণা করে সুনাম অর্জন করেন। তাঁরা বাংলার ও ভারতের গৌরব। এই দুইজনের সঙ্গে ছিল ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতা। আমি এঁদের সমসাময়িক। সুখী হতাম যদি এঁরা নোবেল পুরস্কার পেতেন। শেষ জীবনে ডঃ সাহা লোকসভার সভ্য হন। সভ্য থাকাকালে ১৯৫৬ সালে ১৬ই ফেব্রুয়ারী হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে দিল্লীতে তাঁর দেহত্যাগ হয়। এত শীগগীর চলে যাবেন

ভাবিনি। তাই দুঃখ হয় খুবই। ১৯৭৪ সালে সত্যেনের মৃত্যুর কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

আমরা যারা অভয় আশ্রম গঠন করি তাদের মধ্যে সুরেশদা ও আমি শুধু রোজগার করতাম। দেনা শোধ, সকলের ঢাকায় আসার খরচ, বাবার শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে আমার হাতে যে টাকা ছিল তা শেষ হয়ে যায়। সুরেশদা অস্থায়ী ক্যাপ্টেন আই. এম. এস. পদ হতে ইস্তফা দিয়ে আসার সময় হাজার ছয়েক টাকা পান। তার এক হাজার টাকা দেন যোগেন সাহাকে তার পরিবারের অসুবিধা খানিকটা দূর করার জন্য। বাকী সবটাই দেন আশ্রমে। এবার কাজের জন্য টাকা সংগ্রহ করতে হয়। প্রথম বছর কলকাতা ও ঢাকার বন্ধুদের কাছেই মুখ্যতঃ টাকা সংগ্রহ করি। এর মধ্যে ঢাকার রসায়নের অধ্যাপক ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ দিত মাসে একশ' টাকা—তার মাইনের এক-দশমাংশ। তারপর পঞ্চাশ বছরের উপর দেশসেবার কাজে টাকা সংগ্রহ করতে হয়েছে। খুব কম লোকই না চাইতে টাকা দিয়েছেন। চাইলেও যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সকলে কিছু শ্রদ্ধা সহকারে দেননি। শ্রদ্ধাশীল দাতাদের মধ্যে কুমিল্লার ৺মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। টাকা দিতে পেরে কৃতার্থ, এই ছিল তাঁর মনোভাব। অবশ্য তাঁর চেয়ে বেশী টাকা পেয়েছি অন্যের কাছে। বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পার্শী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকের কাছে টাকা পেয়েছি। সবাইকে জানাই অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা। তা সত্ত্বেও টাকার অভাবে কোন কষ্ট হয়নি বলছি না, তবে অভয় আশ্রমের কর্মীদের চেয়ে বহু কংগ্রেস সেবকের কষ্ট হয়েছে ঢের বেশী। ১৯২১ ও ৩০ সালে বহু তরুণকর্মী তাঁদের সুখ-সুবিধা ত্যাগ করে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যদি দেশের নেতৃবৃন্দ তাঁদের নিম্নতম প্রয়োজন মিটাবার ব্যবস্থাও করতেন তবে একদল কর্মী হয়ে উঠতেন জাতির

সম্পদ। তা হয়নি। এজন্য গভীর দুঃখ। অভয় আশ্রমের বাইরের সামান্য কিছু কর্মীকে আমি সাহায্য করেছি। বেশী পারিনি বলে দুঃখিত। দুঃখের বিষয় দেশের একধর্মী বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে আত্মীয়তা গড়ে উঠেনি। দেশে একদল ত্যাগী কর্মী না হওয়ার এও একটি কারণ। আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে খাঁটি লোকের অভাব। বরাবরই মনে করতাম টাকার অভাবের চেয়ে খাঁটি লোকের অভাব বেশী। জীবন-সন্ধ্যায় আজ মর্মে মর্মে বুঝ্ছি দেশের আসল সম্পদ টাকা বা জমি নয়—মানুষ।

এক বছরে স্বরাজ লাভ বিষয়ে মনে সন্দেহ থাকলেও কংগ্রেসের কার্যক্রম সফল করার জন্য অন্য কোন দিকে মন না দিয়ে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করি। আশ্রমের স্থায়ী জায়গা-বাড়ী-ঘরের কথা চিন্তা করিনি। এক বছর ভাড়া বাড়ীতেই থাকি। কিন্তু তিন মাস যেতে না যেতেই বুঝলাম দেশ স্বাধীনতা লাভের জন্য উপযুক্ত মূল্য দিতে প্রস্তুত নয়। মার্চ মাসে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে আদালত বর্জনের প্রস্তাবে বেশ খানিকটা জল মেশানো হল। আইনজীবীদের অনুরোধ করা হল, তিন মাসের জন্য আদালত বর্জন করতে। এর ফল ভাল হয়নি। কিছু কিছু আইনজীবী তিন মাসের জন্য আদালত বর্জন করেন। তাঁদের অধিকাংশ তিন মাস শেষ হলে আদালতে ফিরে যান। এর প্রতিক্রিয়া জনসাধারণের মনের উপর খারাপ হয়। এরপর আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘট। আসামের চা বাগানের শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের জন্য এ ধর্মঘট। কিছু শ্রমিক চাঁদপুরে এসে জড় হয়। বাংলার একদল কংগ্রেস নেতা ধর্মঘটের মারফত সব অচল করে সহজে স্বাধীনতা লাভ করার স্বপ্ন দেখেন। এমন কি, তিলক স্বরাজ্য ফাণ্ডে বাংলায় সংগৃহীত টাকার অর্ধেকই এই ধর্মঘটের জন্য খরচ হয়ে যায়। যদিও এটা কংগ্রেস কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তা হল মস্তবড় ভুল। সে ভুলের মাশুল দিতে হয়েছে সারা দেশকে। এই নিয়ে কলকাতায় দেশবন্ধুর

বাড়ীতে মহাত্মাজীর উপস্থিতিতে আলোচনার সময় বুঝলাম বাংলার প্রধান প্রধান কর্মী সুস্পষ্ট দুই দলে বিভক্ত। জাতির মন অন্য দিকে বিক্ষিপ্ত না করে কংগ্রেস নির্দিষ্ট-কার্যক্রম পুরা করাই সঙ্গত— এই ছিল মহাত্মাজীর মত। সব কথা শুনে মহাত্মাজী ধর্মঘটের ব্যাপারে তিলক স্বরাজ্য ফাণ্ডের টাকা আর ব্যয় করতে নিষেধ করেন। বাংলার নেতারা তা মেনে নেন। বুঝলাম জাতি তখনো স্বাধীনতা লাভের জন্য পুরা মূল্য দিতে প্রস্তুত নয়। ন্যায্য মূল্য না দিয়ে স্বাধীনতা লাভ হয় না। যদি বা অবস্থাগতিকে তা হয়ও সে স্বাধীনতা হতে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায় না।

১৯২১ সালে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয় সুগায়ক হরেন ঘোষের সঙ্গে—বাড়ী বজ্রযোগিনী, জিলা ঢাকা। এমন দরাজ গলা, জীবনে আর দেখিনি। দশ হাজার লোকের সভায় মাইক ছাড়া গান গাইতেন আর সবাই তা শুনতে পেত। কিন্তু বাংলাদেশের ওস্তাদ গায়কদের মধ্যে আমার সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে হয়েছে বিষ্ণুপুরের গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই দুই গায়কও আজ আর আমাদের মধ্যে নেই।

১৯২১ সালে আশ্রমের জমি, বাড়ী ইত্যাদি করার দিকে যেমন মন দেইনি কংগ্রেসে কোন পদের কথাও ভাবিনি। এমন কি প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভ্য নির্বাচনেও দাঁড়াইনি। সমস্ত মন ছিল গান্ধী তথা কংগ্রেস-নির্দিষ্ট কার্যক্রম সফল করার দিকে। বন্ধুদের অনুরোধে নির্বাচিত সভ্যদের দ্বারা প্রদেশ কমিটিতে যে সভ্য নেওয়া হয় তাতে দাঁড়াতে রাজী হই। একটি আসনে আমার নাম প্রস্তাবিত হলে পুলিনবিহারী দাশের নাম প্রস্তাবিত হয় সেই আসনেই। ভোটে আমি জিতি। এতে আমার মনে কোন আনন্দ হয়নি। পুলিনবাবুকে শ্রদ্ধা করতাম। আন্দামান হতে কারামুক্তির পর কলকাতায় এলে ১৯২০ সালে তাঁকে এবং উল্লাসকর দত্তকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে আলাপ করি। কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলির ভাব দেখে ব্যথিত হই।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নির্বাচনে ভোটাভুটি হয়নি। আমি সভ্য হই। এই কমিটির প্রথম সভা হয় ৪/৫ নভেম্বর দিল্লীতে। এই সভায় স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতিজ্ঞাপত্র, ব্যক্তিগত ও ব্যাপক আইন অমান্য সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই অধিবেশনের সময় স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে অতি নিকটে দেখবার ও তাঁর কথা শুনবার সৌভাগ্য হয়। ৪ঠা নভেম্বর মহাত্মাজীর সঙ্গে কথা বলছি এমন সময় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এলেন। তিনি মহাত্মাজীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আমি সন্ন্যাসী। আমি কেন সূতা কাটব!" উত্তরে মহাত্মাজী বলেন—"লোক-সংগ্রহার্থং।"

এই অধিবেশনের কিছুদিন পর ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারতে আসেন। ঠিক এর আগে অনেক জায়গায় কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করে। যারা অন্যকে স্বেচ্ছাসেবক হতে বলবে তাদের শাস্তি বেশী। ঢাকা জিলা কংগ্রেস কমিটির তখনকার সম্পাদক অতুলচন্দ্র সেন ও আমি স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার জন্য আবেদন করি এবং প্রচারপত্র বিলির ব্যবস্থা করি। আমরা উভয়েই গ্রেপ্তার হই ডিসেম্বরের গোড়ায়। বিচার হয় ঢাকা জেলে। বিচারের সময় বলি—"ইংরেজ সরকারের অস্তিত্বই আমি স্বীকার করি না। তার কোর্টের আমার বিচার করার কোন অধিকার নেই।" এই বলে আর কোন কথা বলি না। সরকার আমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ উপস্থিত করতে পারে না। বিচারক প্রমাণাভাবে আমাকে মুক্তি দেন। অতুলবাবুর বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থিত করে সরকার। বিচারক তাঁর এক বছর জেল দেন। তিন সপ্তাহখানেক জেলে ছিলাম বিচারাধীন আসামী হিসাবে। এই আমার প্রথম জেলের অভিজ্ঞতা। এরপর আইন অমান্য আন্দোলনে পাঁচবার জেলে ও একবার আমেদনগর দুর্গে বন্দী-নিবাসে ছিলাম। আদালতে সাজা বেশী দিনের হলেও দুর্গে আটক থাকার সময় নিয়ে মোট সাড়ে সাত বৎসর আটক ছিলাম। কোথাও খারাপ ব্যবহার পাইনি। তবে সমস্ত

সুপারিণ্টেনডেণ্টের মধ্যে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের মেজর পাটনি আই. এম. এস.-কে আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছে। এমন ভদ্র, কয়েদীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন জেল সুপার বিরল। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সব শ্রেণীর কয়েদী হয়েছি। ১৯৩৩ সালে বে-আইনী ঘোষিত কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হওয়ার অপরাধে কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট অনারেবল সুশীল সিংহের কোর্টে ছয় মাসের জেল হয়। কয়েদী টিকেটে লেখা ছিল "নিরক্ষর"। একজন ভারতীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট হতে এরূপ জিনিস বের হতে পারে তা ছিল কল্পনাতীত। কয়েদীও করে তৃতীয় শ্রেণীর।

সব জেলেই লেখাপড়া করেছি প্রচুর। বাংলা ও ইংরেজী বাদে সংস্কৃত ও হিন্দী শিক্ষার কথা পূর্বেই বলেছি। বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে সামান্য জার্মান জানতাম। জেলে গল্প, ইতিহাস, নাটক, নভেল কবিতা প্রভৃতি পড়বার মত মোটামুটি জার্মান শিখি। আর শিখি গুজরাটী। তবে ভাষা শেখায় আমি তেমন কৃতী নই। তিনখানি বইও লিখি জেলে। ১৯২১ সালে ঢাকা জেলে লিখি উপনিষদের গল্প। ১৯২২ সালে কলকাতায় তার পাণ্ডুলিপি হারাই। ১৯৩০ সালে আলিপুর জেলে ইংরাজীতে লিখি 'নাগপুর হতে লাহোর পর্যন্ত কংগ্রেসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস': 'From Nagpur to Lahore' এই নামে তা ছাপা হয়। আর লিখি 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস'—যা শেষ করি আমেদনগর দুর্গে এবং ছাপা হয় ১৯৪৬ সালে। সুখের বিষয় এই বইখানি পণ্ডিত ব্যক্তিদের বেশ প্রশংসা লাভ করেছে।

১৯২১ ও '২২ সালের গোড়ায়ই বুঝলাম আইন অমান্যের ব্যাপারে অধিকাংশ কংগ্রেসকর্মীর রাষ্ট্রীয় সমিতির নির্ধারিত নিয়ম পালনের দিকে দৃষ্টি নেই। যে-কোন উপায়ে হোক জেল ভর্তি করার দিকেই নজর। সেটা সব চেয়ে বেশী প্রকট হয়েছিল কলকাতায় দেশবন্ধুর গ্রেপ্তারের পর। সত্যাগ্রহ জেল ভর্তি করা নয় এ কথা খুব

কম কংগ্রেসকর্মী উপলব্ধি করেন। এর ফল ভাল হয়নি। মামলায় খালাস পাওয়ার পর ১৯২২ সালে জানুয়ারী মাসে কলকাতা যাই এবং জেলে দেশবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি বিচারের সময় আমার বিবৃতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। কিন্তু মহাত্মাজী ভাইসরয়ের সঙ্গে আপোষ না করায় দেখলাম বেশ অসন্তুষ্ট ও উত্তেজিত। তাঁর বক্তব্য এই ছিল যে, আপোষ প্রস্তাব মেনে নিলে আমরা স্বরাজ লাভ করতাম না বটে, কিন্তু জনগণ খানিকটা জয়ের আস্বাদ পেত এবং তার ফল ভাল হত। এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। সমর্থন করেন দেশবন্ধু ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। এর বিরোধী ছিলেন লালাজী ও মতিলালজী। আমার মতে মহাত্মাজী ঠিকই করেছিলেন একথা বলি দেশবন্ধুকে। আলী ভাইদের মুক্তির ব্যবস্থা না করে এবং গোল টেবিল বৈঠকের সভ্যদের নাম ও তারিখ ঠিক না করে আপোষ করা হত মস্তবড় ভুল। মালব্যজীর প্রস্তাবের উপর মহাত্মাজী এদুইটি বিষয় জুড়ে দিতে চেয়েছিলেন। তা ছিল সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেস অধিবেশন আমেদাবাদে। জেলে থাকায় যেতে পারিনি সেখানে। এই কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচন সমিতিতে মালব্যজী তাঁর প্রস্তাবের পক্ষে মাত্র একটি ভোট পান।

মহাত্মাজীর কার্যক্রমের দুটি অংশ। একটি রাজনৈতিক ও অপরটি গঠনমূলক। দুই অবিচ্ছেদ্য। অহিংস উপায়ে স্বরাজ লাভের জন্য সাম্প্রদায়িক ঐক্য, অস্পৃশ্যতা বর্জন, খাদি প্রচলন, মাদক বর্জন প্রভৃতি আবশ্যিক অঙ্গ। কিন্তু অধিকাংশ কংগ্রেসকর্মী ইংরেজ শাসনের অবসান চাইলেও গঠনমূলক কাজে তাদের আস্থা ছিল না। আসল গলদ এইখানে। হিংসাত্মক কাজও হয় কোন কোন স্থানে। বৃটেনের যুবরাজের আগমন উপলক্ষে বোম্বেতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। ফলে মহাত্মাজী সুরাট জিলার বারদৌলী তালুকে ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখেন। এরপর ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারীর গোড়ায় যুক্ত প্রদেশের গোরক্ষপুর জিলার চৌরীচৌরায় একুশ জন-

পুলিশকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। তখন মহাত্মাজীর ইচ্ছানুসারে ওয়ার্কিং কমিটি বারদৌলীতে ব্যাপক আইন অমান্য অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখে এবং এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ২৪শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে রাষ্ট্রীয় সমিতির সভা ডাকে। এই সভায় মহাত্মাজী তাঁর আইন অমান্য স্থগিতের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। নাগপুরের মহারাষ্ট্রীয় নেতা ডাঃ মুঞ্জে ও বাংলার যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে তাঁদের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। বিপুল ভোটাধিক্যে মহাত্মাজীর প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু সেনগুপ্তের বিরোধিতায় অবাক হয়ে যাই। কারণ এর আগের দিন সেনগুপ্ত সহ আমরা বাংলার ৫ জন সভ্য গিয়ে মহাত্মাজীকে বলি যে, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অনুমতি পেলে ব্যক্তিগত আইন অমান্য ও বিদেশী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করা যাবে এই দুটি তাঁর প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করা হলে বাংলার সভ্যগণ কোন বিরোধিতা করবেন না। মহাত্মাজী ঐ দুইটি বিষয়ই তাঁর প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করেন। এরপর সেনগুপ্তের বিরোধিতা হয়েছিল অনুচিত। এমনটি আশা করিনি। কেন এরূপ করলেন জানি না। সুখের কথা বাংলার অধিকাংশ সভ্য এমনকি সেনগুপ্তের সহকর্মী চাটগাঁর মহিম দাস ও ত্রিপুরা চৌধুরীও তাঁকে সমর্থন করেননি। লালাজী ও মতিলালজী তখন জেলে। তাঁরা বারদৌলী প্রস্তাবের বিরোধিতা করে জেল হতে গোপনে চিঠি পাঠান। কিন্তু এঁরা দুজনেই কারামুক্তির পর বারদৌলী প্রস্তাব সমর্থন করেন। মহাত্মাজী এই প্রস্তাবকে অহিংস সংগ্রামের মস্ত বড় অবদান বলে মনে করেন। তা অতি বাস্তব সত্য। এরূপ না করলে অহিংস সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটত এখানেই। তা হত জাতির পক্ষে অকল্যাণকর।

এরপর ১০ই মার্চ (১৯২২) সরকার মহাত্মাজীকে গ্রেপ্তার করে রাজদ্রোহের অভিযোগে। বিচারে তাঁর ৬ বছর জেল হয়। এক বছরে স্বরাজ লাভ হল না। আন্দোলনের নেতা জেলে। উপরের

স্তরে মতভেদ। সমগ্র দেশে একটা নিরাশার ভাব। কিন্তু আমার মনে নিরাশা ছিল না। গঠনমূলক কাজ যাতে ভাল করে করা যায় সেদিকে মন দিই। কারণ আমার ধারণা এই পথেই জাতি শক্তিশালী হবে স্বরাজ্যের জন্য। তাই অভয় আশ্রমের জায়গা ঘরবাড়ী তৈরীর কথা মনে আসে। কুমিল্লা শহরের উপকণ্ঠে জায়গা পছন্দ হয়। সুরেশদা তখন জেলে। তাঁর কারামুক্তি পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখি। কিছুদিন পরে জেল থেকে বেরিয়ে এসে তিনি এই জায়গা পছন্দ করেন এবং সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয় অভয় আশ্রমের প্রধান কেন্দ্র। এদিকে রাজনীতিক্ষেত্রে একদল দেশবন্ধুর নেতৃত্বে কাউন্সিল প্রবেশনীতি সমর্থন করে। আমি ছিলাম কাউন্সিল বয়কট বা মহাত্মাজীর নীতিতে বিশ্বাসী। বাংলা কংগ্রেস দুই দলে বিভক্ত।

কাউন্সিল প্রবেশ বিরোধীদের কলকাতায় তখন মিলন স্থান ছিল মীর্জাপুর ষ্ট্রীটে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে। ওখানকার সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও মাখনলাল সেন কি উৎসাহ সহকারে সব ব্যবস্থা করতেন। মাখনবাবুকে আগেই জানতাম অনুশীলন সমিতির নেতা হিসাবে। সুরেশবাবুর সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়। ক্রমে দুই জনের সঙ্গেই হয় ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্পর্ক। পরবর্তী জীবনে রাজনৈতিক মতভেদ সত্ত্বেও সে প্রীতির সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয়নি। দুঃখের বিষয় এঁরা দুজনেই আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু মনে গাঁথা রয়েছে বহু মধুর স্মৃতি।

১৯২২ সালে দোল পূর্ণিমার দিন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হতে মহাত্মাজীর মতবাদ প্রচারের জন্য প্রকাশিত হয় দৈনিক 'আনন্দবাজার' পত্রিকা। মুখ্য উদ্যোক্তা সুরেশবাবু ও মাখনবাবু। এই পত্রিকার তিন দিক্‌পাল সম্পাদক বা লেখক প্রফুল্ল সরকার, সত্যেন মজুমদার ও বিবেকানন্দ মুখার্জির সঙ্গে হয় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সত্যেনবাবুর স্মৃতিশক্তি ছিল অতি প্রখর। দিল্লী যাচ্ছি আমরা দুইজন এক কামরায়। আড়াই ঘণ্টাখানেক ধরে রবীন্দ্রনাথের

কবিতা আবৃত্তি করলেন সত্যেনবাবু। আমি একাই নীরব ও গুণমুগ্ধ শ্রোতা।

১৯২২ সালে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নির্বাচনে কাউন্সিল প্রবেশ সমর্থক দলের প্রার্থী বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। আর কাউন্সিল বয়কট সমর্থক দলের প্রার্থী আমি। ১০ ভোটে জিতি। সভাপতি নির্বাচনে ভোটাভুটি হয়নি। দেশবন্ধু বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। কিন্তু শাসমলের পরাজয়ের পর তিনি সভাপতিপদে ইস্তফা দেন। আমাদের অনুরোধেও পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করেন না। তখন তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীকে সভাপতি করা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯২১ সালে দেশবন্ধুর গ্রেপ্তারের পর তাঁর ইচ্ছানুযায়ী শ্যামবাবুকে প্রাদেশিক কমিটির সভাপতি করা হয়। অতএব তাঁকে সভাপতি করে যোগ্য লোককেই যোগ্য স্থান দিয়েছিলাম। এরপর কংগ্রেস অধিবেশন হয় গয়ায়। এই বারেই প্রথম আমার প্রতিনিধি হিসাবে কংগ্রেসে যোগদান। এর পূর্বে ১৯১১, ১৭ ও ২০ সালে কলকাতা কংগ্রেসে যাই দর্শক হিসাবে। গয়া কংগ্রেসের সভাপতি হন দেশবন্ধু। এখানে তিনি খুব জোরালো ভাষায় তাঁর কাউন্সিল প্রবেশ নীতির সমর্থনে যুক্তি দেখান। কাউন্সিল বয়কটের প্রস্তাব উপস্থিত করেন চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী বা রাজাজী। তাঁর প্রস্তাব প্রায় ⅔ অংশ প্রতিনিধির ভোটে পাশ হয়। পরাজিত দেশবন্ধু ও মতিলালজী স্বরাজ্য দল গঠন করেন। একে ত এটা অগণতান্ত্রিক, দ্বিতীয়তঃ, এটা অকল্যাণকরও মনে হয়।

১৯২১ সালের অভিজ্ঞতা হতে মনে হয় এমনিতেই দেশে ত্যাগ-ভাবনা বলতে তেমন কিছু নেই, নিয়মানুবর্তিতাও নেই। কাউন্সিল প্রবেশনীতি গ্রহণ করলে কংগ্রেসে সুবিধাবাদীদের সংখ্যা বেড়ে যাবে। এর পরের ৫।৬ বছরের কংগ্রেসের ইতিহাস আমার আশঙ্কা যে ঠিক তা প্রমাণিত করে। গয়ায় স্পষ্ট বুঝলাম রাজাজী একজন কুশাগ্রবুদ্ধি-

সম্পন্ন লোক। সেখানে প্রমাণিত হল তিনি মহাত্মাজীর মতের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা এবং কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতা। গয়ায় তিনজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়ঃ—(১) ব্রজকিশোর প্রসাদ, (২) রাজেন্দ্র প্রসাদ ও (৩) রাজাজী। এঁরা সবাই আমার চেয়ে বয়সে বড়। ব্রজকিশোরবাবু ছিলেন গয়া কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, চম্পারণ সত্যাগ্রহে মহাত্মাজীর ডানহাত। এরূপ মহাপ্রাণ ব্যক্তি রাজনীতিক্ষেত্রে দুর্লভ। বেশ কয়েক বছর অসুখে শয্যাগত থাকার পর ১৯৪৫ সালে তাঁর দেহত্যাগ হয়। তাঁর মত লোকের অভাব আজও অনুভব করি। রাজাজী ও রাজেনবাবু স্বাধীনতালাভের পূর্বযুগে কংগ্রেসের বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। স্বাধীনোত্তর যুগেও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু প্রথম যুগে যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক হয় চিরদিন তা অক্ষুণ্ণ ছিল। এমন কি পরবর্তী কালের রাজনৈতিক মতভেদ সত্ত্বেও। রাজেনবাবুর সঙ্গে শেষ দেখা ১৯৬২ সালে দিল্লীতে রাষ্ট্রপতিভবনে। ১৯৬৩ সালে ৭৯ বছর বয়সে তাঁর দেহত্যাগ হয়। মনে হল অতি আপন লোককে হারালাম। রাজাজী আমাদের ছেড়ে গিয়েছেন ৯৪ বছর বয়সে ১৯৭২ সালে। ভেবেছিলাম পরিণত বয়সে গিয়েছেন, দুঃখ হবে না। কিন্তু দুঃখ হয়েছে খুবই। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ছাড়াও গয়ায় বিভিন্ন প্রদেশের বহু কংগ্রেসসেবীর সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়। তাঁদের কাছ থেকে শিখি অনেক। বুঝি বাইরের তফাৎ সত্ত্বেও ভারতবাসী আসলে এক। কিন্তু একটি অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতাও হয়।

খিলাফৎ সম্মেলনে মৌলানা মৌলবীরা দুদিন ধরে তুমুল বিতর্ক করছেন কাউন্সিল প্রবেশ 'হারাম' (পাপ) না 'মামনু' (নিষিদ্ধ)। আর কংগ্রেস বিষয় নির্বাচন সমিতি তাঁদের মতের অপেক্ষায় বসে আছে। এ এক অতি অস্বাভাবিক অবস্থা। হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়ের পক্ষেই পুরোহিতের প্রাধান্য ক্ষতিকর। আর একটা জিনিসও বিশেষভাবে লক্ষ্য করি ১৯২১ সাল হতেই। যদিও হিন্দু

মুসলমান উভয় ধর্মের বেশ কিছু সাধারণ লোক 'বন্দে মাতরম্' ও 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি দিত এবং মহাত্মাজীকী জয়ের সাথে 'আলীভাই কী জয়' বলত, সাধারণ কর্মীস্তরে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু উদার লোক ছিলেন, তথাপি মুসলমানদের মধ্যে উচ্চস্তরে সে মনোভাবের অভাব অনুভব করি। প্রগতিশীল বলে খ্যাত মৌলানা হজরত মোহানী ১৯২১ সালে মালাবারে মোপলাদের দ্বারা কিছু হিন্দুকে জোরপূর্বক মুসলমান করা সমর্থন করেন। এ বিষয়ে মহাত্মাজী ইয়ং ইণ্ডিয়ায় লিখেন—"ধর্মের নামে অধর্ম করাই মৌলানা হজরৎ মোহানীর ধর্মীয় নীতি।" এমন কি মৌলানা মহম্মদ আলীও প্রার্থনা করতেন সেদিনের জন্য, যেদিন মহাত্মা গান্ধী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবেন। এসব নিছক ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের পরিপন্থী। হিন্দু খাঁটি হিন্দু, মুসলমান খাঁটি মুসলমান এবং খৃষ্টান খাঁটি খৃষ্টান হলেই সাম্প্রদায়িক ঐক্য সম্ভবপর। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ সকল ধর্মেরই অধিকাংশ লোক নিষ্ঠাসহকারে নিজ নিজ ধর্ম পালন করেন না।

গয়া কংগ্রেসের সময় বুঝি ৬৯ বছরের চাঁদপুরের প্রবীণ নেতা হরদয়াল নাগ অতিশয় সরল অসাম্প্রদায়িক ও ভাবপ্রবণ লোক। তাঁর মত সরল লোক ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে আর একজনকে মাত্র দেখেছি। তিনি হলেন অন্ধ্রের বিখ্যাত নেতা 'কোণ্ডা ভেঙ্কটাপ্যায়া'। একজনের কথা মনে হলেই আর একজনের কথা মনে আসে। এমনকি দুইজনের চেহারাও চোখের সামনে ভেসে ওঠে। পরে হরদয়ালবাবুর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়। তিনি ছিলেন গান্ধী-নীতিতে পুরা বিশ্বাসী এবং তাঁর ভগবদ্‌বিশ্বাস ছিল গভীর। কুমিল্লা অভয় আশ্রমের প্রথম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে তাঁকে সভাপতি হিসাবে পাওয়ার সৌভাগ্য হয়। ৭৯ বছর বয়সে ১৯৩২ সালেও তিনি কারাবরণ করেন। একসঙ্গে ছিলাম দমদম জেলে। ১৯৪২ সালে ৮৯ বছর বয়সে তাঁর দেহত্যাগ হয়। তখন আমি আমেদনগর

দুর্গে বন্দী। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাই অনেক পরে। পরম আত্মীয় বিয়োগ ব্যথা অনুভব করি।

কিন্তু বাংলাদেশে যত দেশপ্রেমিক বিশিষ্ট সেবকের সংস্পর্শে এসেছি তাঁদের মধ্যে সবদিক দিয়ে আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে বগুড়ার যতীন্দ্রমোহন রায়কে। এমন নির্লোভ, অসাম্প্রদায়িক, নাম-যশের কাঙ্গাল নন, নিজের দোষ-ক্রটি সম্বন্ধে সচেতন লোক সারা ভারতেই খুব কম দেখেছি। অত্যন্ত দরদী প্রাণ ছিল তাঁর। আমার সঙ্গে তাঁর প্রাণের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। একসঙ্গে জেলে ছিলাম। কত কথাই না মনে হচ্ছে আজ। ১৯৫১ সালে ৬৮ বছর বয়সে তাঁর দেহত্যাগ হয় কলকাতায়। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করি তাঁর কথা।

গয়া কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুযায়ী আমরা দেশকে আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত করছি। আমাদের প্রচেষ্টাকে আরো শক্তিশালী করার জন্য ১৯২৩ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতায় আসেন রাজাজী, বল্লভভাই প্যাটেল, যমুনালাল বাজাজ ও দেবদাস গান্ধী।

কলকাতা ও বাইরে রাজাজীর সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা লোকের মনের উপর খুব প্রভাব বিস্তার করে। তিনি বক্তৃতা দিতেন ইংরেজীতে। একপদ বা বাক্য বলতেন আমি বাংলায় অনুবাদ করতাম। এরপর তিনি আর একপদ বলতেন। এইভাবে বক্তৃতা দিতে যেয়ে তিনি কখনও খেই হারাননি। বক্তৃতা অনুবাদের কাজ এই আমার প্রথম। সহকর্মীরাও সন্তুষ্ট, নিজের মধ্যেও আত্মপ্রত্যয়।

বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে ভালভাবে মিশবার সুযোগ এই প্রথম। কথাবার্তায় মনে হল তিনি বেশ সুরসিক। পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। স্বাধীনতা লাভের কাজে এবং স্বাধীনোত্তর ভারতে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত গান্ধীনীতি মেনে চলেছেন। কেন্দ্রে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পর সে নীতি অনুযায়ী কাজ করেননি। এমনকি মহাত্মাজীর বিরুদ্ধেও

বলতে শুনেছি। তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা অনেক ফাঁপান হয়েছে। কিন্তু যা ছিল তাও কল্যাণকর হয়নি, যেহেতু উপায়ের বিশুদ্ধতা সব সময় মেনে চলতেন না। ইজরায়েলের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল মাপাই পার্টির সেক্রেটারী কথাপ্রসঙ্গে তাঁদেরই দলনেতা প্রধান মন্ত্রী বেনগুরিয়ণ সম্বন্ধে বলেছিলেন—"বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনেক সময়ই জাতির সম্পদ ও বোঝা দুই-ই।" বল্লভভাইয়ের বেলায় এ কথা খাটে।

যমুনালালজীর সঙ্গে অল্প পরিচয় ছিল ১৯২১ সালে। এবারে আরো বেশী পরিচয় হয়। ক্রমে হয় খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তিনি ছিলেন মহাত্মাজীর খাঁটি অনুরক্ত। তাঁর প্রখর ব্যবসাবুদ্ধি মহাত্মাজীর নীতি সফল করার কাজে লাগান। তাঁর প্রচুর টাকাও এ কাজে ব্যয় করেন। গান্ধীসেবা সংঘ প্রতিষ্ঠার মূলে তিনি। ব্যক্তিগত ব্যবহারে তিনি খুব বিনয়ী ছিলেন। ১৯২৩ সালে নাগপুর সত্যাগ্রহ পরিচালনা করে কারাবরণ করেন। মারওয়াড়ী সমাজে তাঁর চেয়ে ধনী অনেক আছেন। কিন্তু সবদিক দিয়ে বিচার করলে তিনি এই সমাজের মুকুটমণি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে ১৯৪২ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর দেহত্যাগ হয়, এইটিই দুঃখ।

দেবদাস গান্ধী মহাত্মাজীর ছোট ছেলে—রাজাজীর জামাই। এই প্রথম পরিচয়। আলাপে মনে হল রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি বেশ ভাল, কিন্তু পরবর্তীকালে কেন যে শুধু হিন্দুস্থান টাইমস্ কাগজের সম্পাদক হয়েই রইলেন তা বুঝি না। মহাত্মাজীর চার ছেলে—হরিলাল, মণিলাল, রামদাস ও দেবদাস। এই চারজনের সঙ্গেই পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল। তৃতীয় ছেলে রামদাসের সঙ্গে ছিল ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব। দুঃখের বিষয় এঁদের কেউ আজ জীবিত নেই।

যমুনালালজী আইন ব্যবসা ত্যাগকারীদের সাহায্যের জন্য যথেষ্ট করেছেন। আইনজীবী নন এরূপ সবসময়ের কর্মীদের জন্য কিছু

টাকা তুলে দিতে অনুরোধ করি। তিনি গোবর্ধনদাস ভরতিয়ার নিকট হতে ১৪ হাজার টাকা সংগ্রহ করে আমার হাতে দেন। তখন যদি আরো টাকা উঠিয়ে একটা স্থায়ী কর্মী কাণ্ড করা হত তবে বোধহয় ভাল হত।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হওয়ার সময় হতে সুরু করে দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বাংলা ও বাংলার বাইরে বিভিন্ন প্রদেশের বহু দেশসেবকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয়। কারো কারো সঙ্গে আজীবন স্থায়ী বন্ধুত্বও হয়। অবশ্য এদেরও সবার সঙ্গে মত চিরদিন এক থাকেনি। কিন্তু বাংলার একজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও মত আজীবন এক ছিল। তিনি হলেন জিতেন্দ্রমোহন দত্ত। আমার চেয়ে তিন বছরের বড়। রসায়ন বিজ্ঞানে এম. এস-সি। চিরদিন গান্ধীনীতিতে বিশ্বাসী, সৎ, ত্যাগী ও নির্লোভ। প্রথম পরিচয়ের সময় শেয়ার বাজারে কাজ করেন। পরে এর সভাপতি হন। দুঃখের বিষয় তিনি ১৯৬৮ সালে আমাদের মধ্য হতে গিয়েছেন।

১৯২২ সালে মৈমনসিং জিলার করটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলি খাঁ পাণির (চাঁদ মিঞার) কাছে চিরদিন মনে রাখবার মত একটি কথা শুনি। তিনি ছিলেন কাউন্সিল প্রবেশ-বিরোধী। একদিন দেশবন্ধু তাঁকে বলেন—"আসুন, আপনাকে বুঝিয়ে দিব কাউন্সিল প্রবেশ আইন অমান্যকে অধিকতর সফল করার জন্যই প্রয়োজন।" তখন চাঁদমিঞা সাহেব বলেন—"দেখুন, আপনি বড় ব্যারিষ্টার। কথার জোরে অনেক দোষীকে খালাস করেছেন। এই জন্যই আপনাদিগকে হাজার হাজার টাকা দেওয়া হয়। আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করে পারব না। কিন্তু আমার মন বলছে আপনি যা বলেছেন তা ঠিক নয়। আমি আমার মনের নির্দেশই শুনব।" প্রাণের নির্দেশ যুক্তি-তর্কের ঊর্ধ্বে এ কথা অতি ঠিক। দেশবন্ধু নিজেও তা মনে করতেন। তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে দার্জিলিংয়ে

মহাত্মাজীর সঙ্গে আলাপের সময় বলেন —"আমি বার্কেনহেডের কাছে থেকে বড় জিনিস আশা করি।" তখন মহাত্মাজী বলেন –"আমরা যখন দুর্বল তখন বৃটিশ সরকারের কাছে বিশেষ কিছু আশা করা ভুল।" তৎক্ষণাৎ দেশবন্ধু বলেন—"আপনি অতিশয় যুক্তিবাদী।" এখানেই এ বিষয়ে আলোচনা শেষ। কিন্তু ইংরাজ সরকার কিছুই করেনি। অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য যে, অন্তরের নির্দেশ যুক্তি-তর্কের উর্ধ্বে তথাপি তা অনেক সময় মনের ইচ্ছার প্রতিফলন হতে পারে।

আমি সম্পাদক থাকাকালে দুইটি বিশেষ ঘটনা ঘটে :— (১) কেনিয়ায় ভারতীয়দের প্রতি অবিচারের প্রতিবাদে ১৯২৩ সালে আগষ্ট মাসে একদিন ভারতব্যাপী হরতাল ঘোষণা করে কংগ্রেস। কলকাতায় হরতাল আশাতীত সফল হয়। (২) দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে, নাগপুর পতাকা সত্যাগ্রহও তার সফল পরিণতি। নাগপুরে সিভিল লাইন্সের ভিতর দিয়ে জাতীয় পতাকা সহ মিছিল যাওয়া নিষেধ করে সরকার। এর বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ শুরু হয় যমুনালাল বাজাজের নেতৃত্বে। তিনি ও আরো অনেকে কারারুদ্ধ হন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তখন অন্য প্রদেশ হতেও সত্যাগ্রহী পাঠাবার নির্দেশ দেয়। বাংলাদেশ হতে একদল স্বেচ্ছাসেবক পাঠাই। অবশেষে সরকার নতি স্বীকার করে। জাতীয় পতাকা সহ মিছিল যাওয়ার অধিকার স্বীকৃত হয়। এরপর সারা ভারতে কোথাও এরূপ নিষেধাত্মক আদেশ দেয়নি সরকার। যদিও বাংলাদেশ ও ভারতে কংগ্রেসের কাজ মোটামুটি ভালই চলছিল তথাপি কাউন্সিল প্রবেশের ব্যাপার নিয়ে অনেক কিছু ঘটে যায়।

১৯২৩ সালে জুলাই মাসে নাগপুরে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন করার প্রস্তাব হয়। স্বরাজ্যদল ও মধ্যপন্থী জওহরলাল নেহেরুর সমর্থনে মাত্র ৪ ভোটে জিতে মৌলানা আবুলকালাম আজাদ বিশেষ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে

এই অধিবেশন হয়। এই কংগ্রেসে রাজাজী অনুপস্থিত। মৌলানা মহম্মদ আলীর কাউন্সিল প্রবেশের অনুমতিসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু মৌলানার একটি আচরণ অসঙ্গত হয়েছিল। তিনি বক্তৃতায় বলেন—"আমার প্রস্তাবের পক্ষে মহাত্মাজীর বাণী পেয়েছি মনোরাজ্যে।" মহাত্মাজী কোন বাণী দেননি তাঁকে। ইহা সম্পূর্ণ মৌলানার মনগড়া। আমি যত কংগ্রেস দেখেছি তার মধ্যে দিল্লীর এই অধিবেশন সবচেয়ে নিকৃষ্ট। প্যাণ্ডেল তৈরীতে মিলের কাপড়ও ব্যবহৃত হয়েছিল। এমন কি কোন কোন স্বেচ্ছাসেবকের পরনে ছিল মিলের কাপড়। এইসব রাজনৈতিক ডামাডোলে আমি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের পদ হতে সরে আসি। মনে হল যাত্রাপথ দীর্ঘ। এখন মনোযোগ দিই গঠনমূলক কাজে। এরপর ১৯২৩ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন হয় অন্ধ্র প্রদেশের কোকনদে। সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলী। এই অধিবেশনকে আমার দেখা শ্রেষ্ঠ কংগ্রেস বলে মনে হয়েছে। কি সুন্দর ব্যবস্থা। সর্বত্র খাদি, খাদির বিরাট প্যাণ্ডাল। অতি মনোরম খাদিপ্রদর্শনী। উদ্বোধক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। সব দেখে তিনি বলেছিলেন—"আমার বাকী জীবনটা অন্ধ্রদেশে থাকতে পারলে সুখী হতাম।" এই কংগ্রেসে এক আপোষ রফামূলক প্রস্তাব পাশ হয়। প্রস্তাবক রাজাজী, সমর্থক দেশবন্ধু। প্রস্তাবের ব্যাখ্যা দুইজনের দুই রকম। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী এক সংশোধনী প্রস্তাব এনে এমন সুন্দর বক্তৃতা দেন যে, অনেকে চোখের জল ফেলেন। তিনি মহাত্মাজীর কাউন্সিল বয়কট নীতি পুরোপুরি সমর্থন করেন। এই কংগ্রেসে সকল সম্প্রদায়ের প্রায় তিন হাজার লোক একত্র বসে খায়। হিন্দু, মুসলমান, মেয়ে-পুরুষ একত্র বসে খাওয়া দক্ষিণ ভারতে এক অভিনব দৃশ্য। মুগ্ধ হয়ে যাই। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কোণ্ডা ভেঙ্কটাপ্পায়া ও তাঁর সহকর্মীদের সংগঠন শক্তি ও উদার মনোভাবের কথা।

১৯২৪ সালে জানুয়ারী মাসে মহাত্মাজী যারবাদা জেলে বৃহৎ অন্ত্রের সংলগ্ন নালিতে প্রদাহ বা য়্যাপেণ্ডিসাইটিস রোগে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। পুণা সেসুন হাসপাতালের ডাক্তার কর্ণেল ম্যাডক এসে তাঁকে নিজ দায়িত্বে ঐ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে অস্ত্রোপ-চার করেন। মহাত্মাজী বেঁচে যান। তিনি ইংরেজ সরকারের উচ্ছেদ চান। অথচ তাঁর জীবন রক্ষা পেল সেই সরকারের একজন কর্মচারী ইংরেজ সার্জনের মহৎ হৃদয় ও নিজ বিষয়ে দক্ষতার জন্য। ভাবতেও ভাল লাগে। অস্ত্রোপচারের পর একটু সুস্থ হলে ৫ই ফেব্রুয়ারী মহাত্মাজীকে কারামুক্তি দেয় সরকার। এরপর তিনি স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বোম্বের নিকট সমুদ্রতীরে জুহু নামক স্থানে যান। দেশবন্ধু ও মতিলালজী এখানে মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করেন। কাউন্সিল-প্রবেশ অসহযোগের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন, একথা মহাত্মাজী তাঁদিগকে বলেন। কিন্তু স্বরাজ্যদল নেতারা তাঁদের মত বদলান না। তাই মহাত্মাজী তাঁর আদর্শনিষ্ঠ লোকদের নিয়ে কংগ্রেস পরিচালনার জন্য জুনমাসে রাষ্ট্রীয় সমিতির সভায় আমেদাবাদে চারটি প্রস্তাব রাখেন। স্বরাজ্য দলের পক্ষ হতে ঘোর বিরোধিতা হয়। মতিলালজী মহাত্মাজীকে ইংরেজ সরকারের চেয়ে অধিকতর স্বৈরাচারী বলেন এবং সভা হতে বেরিয়ে যান। এরপর গান্ধী-মতাবলম্বীদের মধ্যে যে আদর্শনিষ্ঠা ও দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যাবে ভেবেছিলাম দেখি তার অভাব। মহাত্মাজী খুব দুঃখিত ও বিচলিত। এরূপ বিচলিত তাঁকে জীবনে কখনো দেখিনি। চার প্রস্তাবের পক্ষেই তিনি সামান্য বেশী ভোট পান। তাকে তিনি পরাজয় বলেই মনে করেন এবং রাজনৈতিক কাজ একপ্রকার স্বরাজ্য দলের হাতে ছেড়ে দেওয়া স্থির করেন। তাই হয় গান্ধী-দাশ-নেহেরু চুক্তি। তা অনুমোদিত হয় ১৯২৪ ডিসেম্বরে বেলগাঁও কংগ্রেসে। প্রস্তাবের পক্ষে বলতে যেয়ে মতিলালজী বলেন—"মহাত্মাজী আমাদের সেনাপতি-আমরা সৈনিক। আমাদের কর্তব্য সেনাপতির নির্দেশ মানা।"

লালাজী কংগ্রেসে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। অন্য কথার মধ্যে বলেন—"মতিলালজী যদি সেনাপতি সৈনিক এই মতবাদের কথা না উঠাতেন তবেই ভাল হত। তিনিই প্রথম গয়া কংগ্রেসে মহাত্মাজীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আজ তাঁর মুখে একথা শোভা পায় না।" মতিলালজী একজন বড় উকিল ছিলেন। কিন্তু কখন যে কি বলবেন তা বুঝা যেত না। নির্বাচন প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে আলাপের সময় আমাকে বলেন—"দেখুন ডঃ ঘোষ, নির্বাচন প্রতিশ্রুতি বিয়ের সময় দেওয়া প্রতিশ্রুতির মত—না রাখবার জন্যই।" আমি বলি, "সে কথা আপনি জানেন আমি জানি না।" আমি গান্ধী-দাশ-নেহেরু চুক্তি পছন্দ করি না। তাই মহাত্মাজী বেলগাঁও কংগ্রেসের সভাপতি হলেও প্রতিনিধি হইনি। তবে যাই সেখানে। ছিলাম মহাত্মাজীর শিবিরে। তাঁর দেওয়া বিশিষ্ট দর্শকের কার্ড নিয়ে যাই কংগ্রেসে। এই কংগ্রেসে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি গঙ্গাধররাও দেশপাণ্ডে। বাংলার বাইরের নেতাদের মধ্যে তাঁর সঙ্গে আমার প্রাণের নিবিড় যোগাযোগ ছিল সবচেয়ে বেশী। এরূপ সরল, তেজস্বী ও নিরভিমানী নেতা যে-কোন দেশের পক্ষে গৌরবের। তিনি ছিলেন আমার বয়োজ্যেষ্ঠ। দুঃখের বিষয় তিনিও আজ আমাদের মধ্যে নেই।

১৯২৩ সালে উত্তর বাংলায় ভীষণ বন্যা হয়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সংকটত্রাণ সমিতি করে দুর্গতদের সেবাকার্যে এগিয়ে আসেন। এ কাজে তাঁর ডানহাত ছিলেন তখনকার বেঙ্গল কেমিক্যালের ফ্যাক্টরীর সুপারিণ্টেনডেণ্ট সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। সারাভারত হতে সাহায্য আসে। বুঝলাম ভারত এক। বাংলার কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও অনেক সাধারণ কর্মী সেবাকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেখানে দেখতে গিয়ে বুঝলাম লোকের অভাব ত নেই ই বরং বেশকিছু বেশী আছে। তাই সেখানে সেবাকার্যের ইচ্ছা ত্যাগ করি। ঢাকায় একটি কমিটি গঠন করে কিছু টাকা সংগ্রহ করে আচার্য রায়কে পাঠিয়ে

সন্তুষ্ট হই। এই সেবাকার্যে সতীশবাবু যে সংগঠন শক্তির পরিচয় দেন তা আমাকে আকৃষ্ট করে। পরে এই দুর্গত অঞ্চলে চরখার মাধ্যমে সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। সংকটত্রাণ সমিতির সেবাকার্যের সময় মাঝে মাঝে বেঙ্গল কেমিক্যালের কারখানায় যেতাম সতীশবাবুর কাছে। সেখানে পরিচয় হয় তখনকার বেঙ্গল ক্যামিক্যালের ম্যানেজার রাজশেখর বসুর সঙ্গে। ক্রমে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়। বুঝতে পারি তাঁর মধ্যে যেমন বৈজ্ঞানিকজ্ঞান ও ব্যবসাবুদ্ধি তেমন সাহিত্যিক প্রতিভা। এরূপ সাধারণতঃ দেখা যায় না। তিনিও আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু মনে আছে তাঁর পড়া রসাল গল্প ও তাঁর আমাদের হাসান ও নিজে হেসে কুটিপাটি হওয়া।

সংকটত্রাণের কাজ চলার সময় একদিন বিজ্ঞান কলেজে অপ্রত্যাশিতভাবে ভারত প্রেমিক পিয়ারসনের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, মহাত্মাজী ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত। তিনি নিজে কোন অভিমত না দিয়ে দুই জনকে যে একই দুইটি প্রশ্ন করেছিলেন তা এবং তাঁদের উত্তর বলেন। প্রশ্ন দুইটি ছিল :—(১) 'আপনার সবচেয়ে বড়গুণ কি'? (২) 'আপনার সবচেয়ে বড় দোষ কি'? মহাত্মাজীর উত্তর—(১) "অন্যে জানে আমি জানি না" (২) "আমার দোষ এত বেশী যে, তার মধ্যে কোন্‌টি সবচেয়ে বড় তা ঠিক করতে পারছি না।" রবীন্দ্রনাথের উত্তর—(১) "অসামঞ্জস্য।" (২) "অসামঞ্জস্য।" এই একদিনের আলাপে পিয়ারসনের সঙ্গে বিশেষ হৃদ্যতা হয়। তাঁর সঙ্গে আর কখনো দেখা হয়নি। কিন্তু যেদিন কাগজে তাঁর মৃত্যুসংবাদ পড়ি গভীর দুঃখ হয় মনে।

১৯২৪ সালে সতীশবাবু বেঙ্গল কেমিক্যালের চাকরী ছেড়ে দিয়ে খাদির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় গঠিত হয় 'খাদি প্রতিষ্ঠান' ট্রাষ্ট। সভাপতি আচার্য রায়। গঠনমূলক

কাজের ভিতর দিয়ে দেশকে স্বাধীনতা লাভের দিকে এগিয়ে নেওয়া যাবে এ বিশ্বাস তখন আমার দৃঢ়। খাদি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সে কাজ আরো ভালভাবে করা যাবে ভেবে অভয় আশ্রমের সম্পাদক পদ ছেড়ে দিয়ে খাদি প্রতিষ্ঠানের ট্রাষ্টি হই। অভয় আশ্রমের ন্যায় এখানেও যথাসাধ্য কাজ করি। ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ দিয়ে খাদি প্রচার বাংলার বিভিন্ন জিলায় খাদিফিরি, খুলনায় আচার্য রায়ের গ্রাম রাড়ুলীতে স্বয়ং কাটুনী খাদি কেন্দ্র গঠন, খাদি প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ সংগ্রহে কিছু সাহায্য করা এই ছিল আমার মুখ্য কাজ। কিন্তু দু'বছর যেতে না যেতেই বুঝি সতীশবাবুর সঙ্গে একযোগে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। গঠনমূলক কাজে আমার পুরা বিশ্বাস অথচ বাংলার দুইটি এ কাজের বড় প্রতিষ্ঠান হতে সরে আসতে হল। মনে গভীর দুঃখ। ভাবছি কি করব। তৎকালীন অভয় আশ্রমের সম্পাদক ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ বসুর বিশেষ আগ্রহে পুনরায় অভয় আশ্রমে যোগ দেওয়া স্থির করি। তবে যোগ দেওয়ার পূর্বে একটি কথা ঠিক করে নেই। আশ্রমের কার্যকরী সমিতির কোন সভ্য যদি কোন প্রস্তাবের জোর বিরোধিতা করেন তবে ভোটের জোরে তা পাশ করা হবে না। তাতে যদি কাজ কম হয় তাও ভাল। সুরেশদা এই কথা মেনে নেন। কার্যতঃ আমরা তা করতে পেরেছিলাম বলেই কোন কোন বিষয়ে মতভেদ সত্ত্বেও ১৯২৬ সাল হতে ১৯৬২ সালে সুরেশদার মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৬ বছর একযোগে কাজ করতে পেরেছি। এই দীর্ঘকালই তিনি আশ্রমের সভাপতি আর আমি সম্পাদক।

সমুদ্র ও পাহাড়ের প্রতি আকর্ষণ আমার বরাবর। পুরী গিয়েছি এর মধ্যে কয়েকবার। প্রথম যাই ১৯১৫ সালে। এতটা মুগ্ধ হই যে, প্রথম রাত সমুদ্রের ধারে বেঞ্চের উপর শুয়ে কাটাই। কি অপূর্ব শোভা। জীবনে ভারত ও ভারতের বাইরে অনেক সমুদ্র সৈকতে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু পুরীর সমুদ্র সৈকত

আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে। অবশ্য পাহাড়-পর্বতের মধ্যে ১৯২৪ সালের পূর্বে যা দেখেছি তার মধ্যে চাটগাঁর পাহাড়ই সবচেয়ে উঁচু। নদী, সমুদ্র, পাহাড় মিলিয়ে চাটগাঁ বাংলার অতি মনোরম স্থান। বসন্তে কি ফুলের বাহার। কিন্তু দেখা হয়নি দেবতাত্মা হিমালয়। আর ইচ্ছা ছিল তীর্থ পর্যটনেরও। তাই ১৯২৪ সালে মে মাসে অসহযোগ আন্দোলনের ৪ জন সঙ্গী সহ কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণ যাই। হৃষীকেশ হয়ে যাই রামনগর হয়ে ফিরি। প্রায় ৪৫০ মাইল হাঁটা পথ। তুঙ্গনাথও গিয়েছিলাম। এইটিই এই যাত্রার সর্বোচ্চ স্থান। প্রায় ১৪ হাজার ফুট উঁচু। তুঙ্গনাথের পথে দুধারে ফুলে ভরা রডোডেনড্রন গাছ। আজও তা মনে পড়ে। মোট ২৭ দিন লেগেছিল এই তীর্থযাত্রায়।

যাওয়ার সময় হৃষীকেশ হতে 'জিমরা' নামে এক গাড়োয়ালী কুলী নিয়েছিলাম আমাদের মাল বইবার জন্য। তাকে কুলী বলা ভুল হবে। এই দুর্গম পথে সে ছিল আমাদের পরম সুহৃদ। তার গুণে মুগ্ধ হই। কেদার-বদরীর পাণ্ডারাও ছিল অতি সহৃদয়। ভীষণ ঠাণ্ডার মধ্যে তাঁদের হৃদয় ছিল গরম। যাত্রাপথে দেবপ্রয়াগে পূর্বপুরুষদের শ্রাদ্ধ করি। সঙ্গে সঙ্গে নিজের শ্রাদ্ধও। বুঝে এলাম সত্যিই 'দেবতাত্মা হিমালয়'। এরপর ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য লোকে যেসব স্থানে যায় তার বহু জায়গা দেখেছি। সবচেয়ে ভাল লেগেছে 'উতকামণ্ডকে'। আর মনে হয়েছে নীলগিরি পর্বতের অধিবাসী 'টোডা'রা অতি সরল ও সুন্দর।

তীর্থযাত্রা শেষ করে জুন মাসে সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগ দিই। দেশবন্ধু এই সম্মেলনে মুসলমানদের তাদের লোকসংখ্যার অনুপাতে চাকরী দেওয়ার প্রস্তাব পাশ করেন। এর বিরোধিতা করেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। ঠিকই করেছিলেন শ্যামবাবু। সবার জন্য একটা নিম্ন আয়ের ব্যবস্থা করে যোগ্যতা অনুসারে চাকরী দেওয়াই সঙ্গত। নইলে প্রতিষ্ঠিত হবে

অনগ্রসরতার কায়েমী স্বার্থ। অথচ দেশের ঝোঁক আজ সেদিকেই বেশী—যা সবারই পক্ষে অকল্যাণকর।

এই সময়ের কাছাকাছি ভারতের বহুস্থানে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। সবচেয়ে দুঃখ জনক ঘটনা ঘটে উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশের কোহাটে ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বরে। মহাত্মাজী ও মৌলানা সৌকত আলীর উপর ভার পড়ে তদন্ত করে রিপোর্ট দেওয়ার। দুঃখের বিষয় তাঁরা একমত হতে পারেননি। অথচ এই মৌলানা সাহেবই মাত্র কয়েকমাস আগে রাষ্ট্রীয় সমিতির সভায় আমেদাবাদে নিজেকে মহাত্মাজীর অনুগামী এবং তিনি সৈনিক আর মহাত্মাজী সেনাপতি বলেছিলেন। এরূপ ধরনের কথা প্রায়শঃই সুবিধাবাদীদের কথা।

হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার জন্য ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে মহাত্মাজী তিন সপ্তাহের জন্য উপবাস করেন। ফল হয় সাময়িক। কোন স্থায়ী সম্প্রীতি হয়নি। ১৯২৫ সালে মে মাসে মহাত্মাজী 'ইয়ং ইণ্ডিয়ায়' লিখেন—"আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই কথাই বহাল করে যে মুসলমান সাধারণত তর্জন-গর্জনকারী আর হিন্দু সাধারণতঃ ভীরু।" কিন্তু অন্য অভিজ্ঞতা স্পষ্ট হয় ১৯৪৬ সালে দেশভাগের কিছু পূর্বে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি শিখ যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে তর্জন-গর্জনকারী আর যেখানে সংখ্যালঘিষ্ঠ সেখানে ভীরু। এর ব্যতিক্রম খুবই কম। হিন্দু-মুসলমান অসম্প্রীতির শোচনীয় পরিণতি ১৯২৬ সালে এক মুসলমান সাক্ষাৎকারীর গুলিতে রোগশয্যায় শায়িত স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মৃত্যু। অথচ একদিন এই স্বামীজীই মুসলমানদের অনুরোধে দিল্লীর জুম্মা মসজিদে বক্তৃতা দেন। হায়রে জনমত, হায়রে ধর্মান্ধতা! উপরের স্তরে যারা উস্কানি দেয় তারাই এজন্য অধিক দায়ী। মুসলমান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে এ ব্যাপারে আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে রফি আমেদ কিদোয়াইকে। যেমনি অসম্প্রদায়িক

তেমনি ছিল তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা। তাঁর সঙ্গে মতের মিলও হয়েছে অমিলও হয়েছে। কিন্তু উপরোক্ত দুই গুণের জন্য তাঁকে বরাবর প্রীতির চোখে দেখেছি। দুঃখের বিষয় তিনিও অনেকদিন আমাদের মধ্যে নেই।

১৯২২ সালে রাজনৈতিক দলাদলির সময় অপর দলের পুরুষ কর্মীকে গুপ্তচর এবং মেয়ে কর্মীকে চরিত্রহীন বলা আমাকে খুবই ব্যথিত করত। এরূপ আচরণ নিতান্ত গর্হিত। সে সময়কার মেয়ে কর্মীদের মধ্যে দেশবন্ধুর বোন উর্মিলা দেবীকে তাঁর স্নেহ-প্রবণ মাতৃসুলভ প্রাণের জন্য আমার খুব ভাল লাগত। এমন কি তাঁর ঝগড়ার মধ্যেও একটা মাধুর্য্য ছিল। এরপর ১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহের সময় মেয়েরা অনেক বেশী সংখ্যায় আন্দোলনে যোগ দেন। এই সময় লাবণ্যলতা চন্দ সরকারী কুমিল্লা উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদ ছেড়ে দিয়ে আন্দোলনে যোগ দেন। এই সময় হতে ১৯৬৯ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দেশসেবা করে গিয়েছেন। তিনি আমার কয়েক মাসের বড় ছিলেন। তাঁকে ননীদি বলেই ডাকতাম। বাংলাদেশের মহিলা কর্মীদের মধ্যে তাঁকেই আমার শ্রেষ্ঠ মনে হয়েছে। ত্যাগী, মিষ্টি স্বভাব ও বুদ্ধিমতী, মোটেই কোন পদলোভী ছিলেন না। বাংলাদেশে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজের ভার দেন মহাত্মাজী তাঁকে। কস্তুরবা নিধিরও বাংলার প্রথম সঞ্চালিকা তিনি। তাঁর অভাব এখন বোধ করি বিশেষভাবে। আমার বোন কুমারী যমুনা ঘোষ হয় তাঁর ডান হাত। যমুনাও আজীবন ত্যাগী ও দেশসেবী। ব্যথা পাই যমুনাও বর্ত্তমানে একটি আঘাতের দরুণ স্বচ্ছন্দভাবে চলা-ফেরা করতে পারে না দেখে। তবে সারা ভারতের নেতৃস্থানীয় মহিলা কর্মীদের মধ্যে সরোজিনী নাইডু আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আমি তাঁকে 'আক্কা' (মারাঠী শব্দ অর্থ দিদি) বলতাম। খুব খোলাখুলিভাবে আলাপ করতে পারতাম তাঁর সঙ্গে। একদিন তাঁকে বলি—"আক্কা,

মেয়েরা সাধারণতঃ স্নেহপ্রবণ ও দয়ালু হৃদয় কিন্তু তারা যখন নিষ্ঠুর হয় তখন কোথায় লাগে পুরুষ তাদের কাছে।” আক্কা বললেন—“ঠিক বলেছ প্রফুল্ল।” দুঃখের বিষয় আক্কাও আমাদের মধ্য হতে গেলেন ১৯৪৯এ।

১৯২৫ সালে মহাত্মাজী আসেন বাংলা সফরে। ফরিদপুরে প্রাদেশিক সম্মিলনীতে যোগ দিয়ে প্রথমেই বিক্রমপুরে আসেন দুই দিনের জন্য নদীর ধারে চারটি কেন্দ্রে:—(১) মালিকান্দা, (২) লৌহজং (৩) বাহেরক ও (৪) ফুরশাইল। সব জায়গায়ই হাজার হাজার লোক আসে। সবচেয়ে বেশী ফুরশাইলে—প্রায় ৫০ হাজার। কিন্তু কোথাও ‘মহাত্মাজী কী জয়’ বলে চীৎকার বা তাঁর পা ছোঁয়ার চেষ্টা ছিল না। হিন্দুরা হাত জোড় করে নমস্কার ও মুসলমানরা ডান হাত তুলে আদাব দিয়েছে। তাতে তিনি খুব খুশী। এই অঞ্চলের কর্মীদের সংগঠন শক্তি ও জনগণের সহযোগিতা প্রশংসার্হ। এই দুই দিনে মহাত্মাজীর কাছ থেকে শিখি অনেক। ইংরেজীতে মানপত্র দেওয়া তিনি অপছন্দ করেন। হয় হিন্দী, নয়ত বাংলায় দিতে বলেন। তাঁর উত্তর হতে বুঝি বাংলা মানপত্রের মর্ম তিনি বুঝেছেন। এক জায়গায় “আমার দেশের লোকের কাছে আমার মর্য্যাদার কোন প্রশ্নই ওঠে না”—এই উক্তি খুব ভাল লাগে। কিন্তু এই সফরে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা লৌহজংয়ে পদ্মাবক্ষে লঞ্চের ছাদের উপর ফুটফুটে জোৎস্নায় শুয়ে শুয়ে একেবারে তন্ময় হয়ে বুদ্ধের প্রেমধর্ম সম্বন্ধে আমাদিগকে উপদেশ দেওয়া। সেদিন ছিল বুদ্ধ পূর্ণিমা। দীর্ঘ ২৭ বছরের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্যে এমনভাবে তাঁকে আর কখনো পাইনি। ফুরশাইল হতে লঞ্চে চাঁদপুর যাওয়ার পথে বিক্রমপুরের কর্মীদের সামনে বলেন—“চরখায়ই স্বরাজ”। চরখা গ্রামশিল্পের কেন্দ্র স্বরূপ। এর সুষ্ঠু প্রচলন গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রতীক। গ্রামের উন্নতি ভিন্ন দেশের উন্নতি অসম্ভব। কারণ ভারতের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে। এই যাত্রাপথে ঝড় উঠলে

মহাত্মাজী বলেন—"আমি ঝড় পছন্দ করি"। এ তাঁর বৈপ্লবিক মনের অভিব্যক্তি। এরূপ উক্তি সফরের প্রথম দিনও করেছিলেন।

এই সফরের সময় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ও দেশবন্ধু অসুস্থ ছিলেন। মহাত্মাজী দুইজনকেই দেখতে যান। ব্যারাকপুরে সুরেন্দ্রনাথকে দেখে এসে 'ইয়ং ইণ্ডিয়ায়' 'ব্যারাকপুরের ঋষি' নাম দিয়ে এক নিবন্ধ লিখেন। তাঁর সঙ্গে সে সময় মতভেদ সত্ত্বেও দেখিয়ে দিলেন যে, জাতীয় জাগরণে সুরেন্দ্রনাথের দান ভুলবার নয় এবং তিনি একজন নমস্য ব্যক্তি। এই মনোভাব প্রত্যেক দেশসেবকের অনুকরণযোগ্য। মহাত্মাজী দেশবন্ধুকে দেখতে যান দার্জিলিং। ১৯২৫ সালেই দেশবন্ধু চিরবিদায় নিলেন ১৬ই জুন, আর সুরেন্দ্রনাথ নিলেন ৬ই আগষ্ট।

এই সফরের সময় অনেক জায়গায়ই ছিলাম মহাত্মাজীর সঙ্গে। ত্রিপুরা নোয়াখালী জিলায় ট্রেনে রাত্রিতে যাওয়ার সময় প্রত্যেক স্টেশনে হিন্দু মুসলমান বহুলোক এসে হারিকেন ল্যাণ্টার্ণ প্রায় তাঁর মুখের সামনে ধরে তাঁকে দেখতে থাকে। রাতে ঘুমাতে পারেন না। মহাত্মা হওয়ার এই শাস্তি!

এই সফরের সময় মহাত্মাজীকে রাগ করতে দেখি নারায়ণগঞ্জ শহরে। যেমনটি জীবনে আর কখনো দেখেনি। স্বেচ্ছাসেবকরা তাঁর নির্দেশ শুনছিল না তাতে অসুবিধা হয়। তাই সভার সামনে গিয়ে গাড়ী থামলে তিনি গাড়ী হতে নেমেই রাগতঃ বলেন—"স্বেচ্ছাসেবকগণ, যে যেখানে আছ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাক। যদি একজনও নড়চড় কর তবে আমি গাড়ীতে ফিরে যাব।"

ঢাকা শহরে কর্মব্যস্ততার মধ্যেও প্রায় ৪৫ মিনিট বিখ্যাত ভগবান সেতারীর সেতার বাজনা শোনেন একেবারে তন্ময় হয়ে। জলপাইগুড়ি স্টেশনে বুঝি, কোথাও যাওয়ার কথা দিলে তা রক্ষা করার বিশেষ আগ্রহ। দৃঢ় কণ্ঠে বলেন—"জনগণের সঙ্গে সাক্ষাতের

কথা দেওয়া ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা দেওয়ার সামিল।" চাটগাঁ জিলার বিভিন্ন স্থলে যাওয়ার সময় দুর্গাপুরে একটি আঁদর্শ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও কিছু ছাত্রের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ হয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা কৃষি কাজ করত এবং তাদের খাদিপরা বাধ্যতামূলক ছিল। নগেনবাবুর এই শুভ প্রচেষ্টা খুব ভাল লাগে। তিনি আমার অন্তরঙ্গ রামকৃষ্ণ মিশনের স্বর্গত স্বামী নিখিলানন্দের মামা। নিখিলানন্দ (দীনেশ মহারাজ) ছেলেবেলায় এই মামার কাছেই ছিল।

দেশবন্ধুর ইচ্ছায় মহাত্মাজী পাবনা জিলার হিমাইতপুর অনুকুল ঠাকুরের সৎসংঘ আশ্রমে যান। আমি যেতে পারিনি সেখানে। পরে যখনই প্রথম দেখা জিজ্ঞাসা করি কিরূপ প্রভাব হল তাঁর মনের উপর। মহাত্মাজী বলেন—"আমার মনের উপর মোটেই প্রভাব পড়েনি।"

১৯২৬ সালে গৌহাটি কংগ্রেসে যাই কুমিল্লা হতে ট্রেনে। রাস্তায় হাফলং হতে পার্বত্য অঞ্চলের দৃশ্য অতি মনোরম। এরূপ মনোরম দৃশ্য আর জীবনে দেখিনি বললেও চলে। এই কংগ্রেসের সময় একদিন দেখি গৌহাটীর অদূরে পাহাড়ের উপর অবস্থিত কামাখ্যা মন্দির। নয়নমনোমুগ্ধকর। আসামের ভাষাও বাংলার অতি নিকটতম মনে হয়। পরবর্তীকালে শঙ্কর দেবের 'কীর্তনঘোষা' ও মাধবদেবের 'নামঘোষা' পড়ে মনে হয় বাংলা, আসামী ও উড়িয়া এক গোত্রীয় ভাষা। সব মিলিয়ে আসামকে খুব ভাল লাগে। কিন্তু গৌহাটী কংগ্রেস হতে কোন প্রেরণা পাইনি। এই কংগ্রেসের সভাপতি বিখ্যাত আইনজীবী স্বরাজ্য দলের অন্যতম নেতা শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার। তিনি মাদ্রাজের অ্যাডভোকেট-জেনারেল ছিলেন। তাঁর একটি নির্দেশ শুনে একেবারে হতবাক্ হয়ে যাই। খাদি না পরা কংগ্রেস প্রতিনিধি ভোট দিতে পারবেন না এই প্রশ্ন উঠান একজন। সভাপতি নির্দেশ দেন—"স্বভাব মদ্যপায়ী বলতে যেমন বুঝায়

না যে সে ২৪ ঘণ্টা মদ খায় তেমনি স্বভাব খাদি পরা মানে এই নয় যে সে সব সময়ই খাদি পরে।" এই যুক্তি দিয়ে সবাইকে ভোট দিতে দেন তিনি। এরপর অবশ্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি স্পষ্ট নির্দেশ দেয় যে কংগ্রেস প্রতিনিধিকে কংগ্রেসের কোন কাজে থাকা কালে খাদি পরিহিত হতেই হবে—নইলে ভোটের অধিকারী হবে না।

গৌহাটী হতে বুঝলাম শিগগীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কোন সম্ভাবনা নেই। তাই ১৯২৭ ও '২৮ সালে কংগ্রেসের প্রতিনিধিও হইনি, অধিবেশনেও যাইনি। সমস্ত সময় ও শক্তি ব্যয় করি গঠনমূলক কাজে।

১৯২৭ সালে প্রথম ব্যক্তিগত পরিচয় হয় কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ক্রমে হয় একটা প্রীতির সম্পর্ক। তাঁর মত 'গপ্পে' লোক আমার জীবনে দেখিনি। তিনি বহুবার আমায় বলেছেন, "প্রফুল্ল বামুনের মধ্যে যত পাগল তার অর্ধেকের বেশীই চাটুজ্যে।" ১৯২৯ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁকে পাওয়ার সৌভাগ্য হয় মালিকান্দায় ছাত্র-যুবকদের সভায় সভাপতিরূপে। 'সত্যাশ্রয়ী' নামে লিখিত তাঁর ছোট অভিভাষণটি শরৎ রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। ১৯৩৮ সালে তিনি আমাদের মধ্য হতে চলে গিয়েছেন।

১৯২৮ সালে কংগ্রেস অধিবেশন হয় কলকাতায়—সভাপতি মতিলালজী। তিনি, মহাত্মাজী, জওহরলালজী ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে আলোচনার ফলে এক আপোষ রক্ষা প্রস্তাব স্থির হয়। তা উত্থাপন করেন মহাত্মাজী। সুভাষ ও জওহরলালজী নিজ নিজ অনুগামীদের চাপে সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। এ বিষয়ে মহাত্মাজী বলেন—"যদি ২৪ ঘণ্টা নিজেদের কথা অনড় রাখতে না পারেন তবে স্বরাজের কথা বলবেন না।" ভোটে অবশ্য মহাত্মাজীর প্রস্তাব পাশ হয়।

১৯২৮ সালে কৃষকদের ন্যায্যদাবী পূরণের জন্য—স্বরাজের জন্য নয়—বারদৌলী তালুকে খাজনা বন্ধ আন্দোলন হয়। আমাদের সমর্থনের অভিব্যক্তিস্বরূপ কুমিল্লা হতে কিছু টাকা সংগ্রহ করে

পাঠাই। আন্দোলন সফল হয়। নেতৃত্ব করেন বল্লভভাই। এরপর থেকে তাঁকে বলা হয় সর্দার বল্লভভাই।

১৯২৬ সালে অভয় আশ্রমে যোগ দিয়ে বছর তিনেক কয়েকটি কাজে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করি: (১) খাদি পাকা রং করা ও ছাপান, (২) কৃষি, গো-পালন ও মাছের চাষ, (৩) বিজ্ঞান চর্চা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসার, (৪) জাতীয় শিক্ষা বিস্তার ও (৫) পুস্তক প্রকাশ। পূর্বে চরখার সুতা ও খাদির অধিকাংশ রং করা হত বাইরে। রং বিভাগ খুলে সে কাজ কতকটা আশ্রমে হওয়ায় সুবিধা হয়। পূর্বে আশ্রমে গরু ছিল না। ঢাকা হতে ভাল দুধের গরু এনে গো-পালন করায় আশ্রমে প্রয়োজনমত খাঁটি দুধ মিলত। একটা ছোট পুকুর কেটে তাতে প্রথম পোনা ছেড়ে এক বছরে এক সের খানেক ওজনের হলে বড় পুকুরে ছাড়া হত। এতে মাছের উৎপাদন বেড়ে যায়। কৃষির উন্নতির জন্য জমিতে বছরে তিন ফসল উৎপন্ন করার কাজে সফল হই। পূর্বে কুমিল্লা অঞ্চলে বাঁধা কপি ইত্যাদি হত না, ঢাকা হতে আসত। কপি উৎপাদনে কৃতকার্য্য হই। কপি চাষ লাভজনকও হয়। একটা টমেটো একসের পর্যন্ত হয়। স্থানীয় কৃষকরাও দেখে পরের বছর হতে কপি চাষ আরম্ভ করে। ক্রমে এই চাষ হয় ব্যাপক। ধান, শাকসব্জী, মাছ, দুধ, লেবু, ফল প্রভৃতি তৈরীর কাজ ভালভাবেই এগোয়। ১৯২৮ সালে আশ্রমের খাওয়াকে নিম্নতম সুষম খাদ্য বলা চলত। শ্রমিক প্রভৃতি সবারই জন্য এক খাওয়া। এরপর স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত কুমিল্লায় এলে তাঁকে নিয়ে আসি আশ্রমে। সব ব্যবস্থা দেখে এক সঙ্গে বসে খেয়ে মন্তব্য করেন—"এই ত কাজে কমিউনিজম।" তিনি প্রার্থনার সময় পর্যন্ত ছিলেন না। ধর্মভিত্তিক সাম্য অভয় আশ্রমের উদ্দেশ্য। এই ভারতীয় কৃষ্টির মূলকথা।

আশ্রম বিদ্যালয়ে রসায়ন বিজ্ঞান পড়াতাম বাংলায়। তাতে বাঙ্গালী ছাত্ররা ঐ বিজ্ঞান সহজে বুঝত। উপলব্ধি করি সব

বিষয়ের জন্য সর্বস্তরে মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত। কিন্তু স্বাধীনোত্তর ভারতে একদল 'নয়া ইংরেজ' বলতে আরম্ভ করেছে যে, বিজ্ঞান পড়াবার জন্য ইংরেজী দরকার। ১৯৬৯ সালে একদিন অধ্যাপক সত্যেন বোসকে জিজ্ঞাসা করি—"ভাই, আমি অনেকদিন বিজ্ঞান চর্চা হতে দূরে। বাঙ্গালী ছাত্রদের পদার্থবিদ্যা বাংলায় পড়ান সম্বন্ধে তোমার মত কি?" উত্তরে সত্যেন বলে—"ভাই, যে বলে পদার্থবিদ্যা বাংলায় পড়ান যায় না সে বাংলাও জানে না পদার্থবিদ্যাও জানে না।"

ছাত্রদিগকে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র ধূমকেতু প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান দেই। ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ স্লাইড করিয়ে কুমিল্লা শহরে টিকেট করে বক্তৃতা দিই। ছাত্রদের জন্য টিকেট মূল্য চার আনা আর অন্যদের জন্য এক টাকা। টিকেট মূল্য হতে স্লাইড ইত্যাদি তৈরীর খরচ ওঠে যায়।

বই প্রকাশনের কাজেও খানিকটা এগোই। আমি লিখি 'সাধারণ জ্ঞান' ও 'বিজ্ঞানের কথা। দেবেন সেন লেখে 'গল্পে ইতিহাস' এবং ডাঃ নৃপেন বসু 'স্বাস্থ্যবিজ্ঞান'। লোকসান হয়নি প্রকাশনের কাজে। সামান্য কিছু লাভ হয়। তবে আজ আমার মনে হয় বিজ্ঞানের কথা আরো সহজ করে লেখা যায়।

১৯২৬ সালে কুমিল্লা অভয় আশ্রম একটি দুঃখজনক ঘটনার সঙ্গে জড়িত হয়। সুরেশদার পরিকল্পনা অনুযায়ী বড় করে জন্মাষ্টমীর মিছিলের ব্যবস্থা হয়। নমাজের সময় বাদ দিয়ে মিছিল যায়। তথাপি আশ্রমের দক্ষিণ দিকে গ্রামের মসজিদ হতে লোক বেরিয়ে মিছিল আক্রমণ করে। হয় মারামারি এবং খুন। মামলায় আশ্রমের সব কর্মীই খালাস পায়। ঢাকার সরকারী উকিল শশাঙ্ক ঘোষ আমাদের উকিল ছিলেন। কোন পয়সা নেননি, কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁকে। দুঃখের বিষয় তিনি অনেকদিন আমাদের মধ্য হতে চলে গিয়েছেন।

১৯২৯ সালে পুনরায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাই কংগ্রেসের প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রীয় সমিতির সভ্য হই এবং লাহোর কংগ্রেসে যোগ দেই। এই কংগ্রেসে গান্ধী নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। কংগ্রেসের মূলনীতি হল পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ। লাহোরে একদিন মহাত্মাজীর দেওয়া সময় ভোর সাড়ে চারটায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। ভীষণ ঠাণ্ডা। গরম কোটের উপর কম্বল জড়িয়ে গিয়েছিলাম। মহাত্মাজীও বৈদ্যুতিক তাপযন্ত্র ব্যবহার করছিলেন। প্রথমেই বললেন—"এই ঠাণ্ডার সময় কংগ্রেস অধিবেশন করা চলবে না। গরীবদের অশেষ কষ্ট হয়।" ডিসেম্বরের শেষের দিকে কংগ্রেস অধিবেশন করার দীর্ঘ দিনের নিয়ম বদলে দিলেন। দরিদ্রের প্রতি কি দরদ! ২৬শে জানুয়ারী ১৯৩০ স্বাধীনতা দিবস বলে ঘোষণা করে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি। সারা ভারতে বহুস্থানে একটি সংকল্প বাক্য জনসভায় গৃহীত হয়। তার আসল কথা হল—'ইংরেজ শাসনে ভারতের রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক এই চার প্রকারের সর্বনাশ হয়েছে। তাই চাই এই শাসনের অবসান ও স্বাধীনতা লাভ।' হাজার দশেক লোকের সামনে এই সংকল্প বাক্য পাঠ করি কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। বিপুল উৎসাহ জনগণের।

মহাত্মাজীর নেতৃত্বে লবণ সত্যাগ্রহ করা স্থির হয়। বাংলা কংগ্রেস দুই দলে বিভক্ত। গান্ধী অনুগামীরা সংখ্যায় সামান্য কম। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি অপর দলের হাতে। তারা এই আন্দোলন যথেষ্ট উৎসাহ সহকারে পরিচালনা না করতে পারেন ভেবে আমরা 'আইন অমান্য পরিষদ' গঠন করি কংগ্রেস-নির্দিষ্ট আন্দোলন পরিচালনার জন্য। এর সভাপতি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সম্পাদক আমি ও ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। ১৯৩৩ সালে ২১শে জুলাই রাঁচিতে আটক থাকা অবস্থায় যতীন্দ্রমোহনের দেহত্যাগ হয়। ক্ষিতীশবাবুও বেশ কয়েক বছর যাবৎ শারীরিক অসুস্থতার

জন্য সকল কাজ হতে অবসর নিতে বাধ্য হয়েছেন। ক্ষিতীশবাবু আমার চেয়ে দুই বছরের বড়। তাঁর সঙ্গে কাজ করে সর্ব সময়ই আনন্দ পেয়েছি।

সুরেশদা অভয় আশ্রমের সামনে এই প্রস্তাব রাখেন যে, বাঁকুড়া হতে পদযাত্রা করে কাঁথি মহকুমায় গিয়ে লবণ তৈরী করে আইন অমান্য করা হোক। আশ্রমের সবাই সে প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করে। ৪০ জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে আমি কলকাতায় আসি। বিরাট অভ্যর্থনা দেওয়া হয় এঁদের শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। ভগ্নস্বাস্থ্য শ্যামবাবু এসে আশীর্বাদ করে যান। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল সিমলা ব্যায়াম সমিতিতে। বাঁকুড়া হতে কাঁথি মহকুমার পিছাবনীতে পদযাত্রার নেতৃত্ব করেন সুরেশদা। এই পদযাত্রা খুব সাড়া জাগায়। রাস্তায় বহুস্থানে এঁরা অভ্যর্থিত হন। বহুবার সুরেশদা আমাকে বলেছেন—"প্রফুল্ল, এই আমার জীবনের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায়।" লবণ তৈরী করে আইন অমান্যের কাজ কাঁথি ছাড়া বাংলাদেশে আরো কয়েকটি স্থানে হয়। কলকাতার অল্পদূরে ২৪ পরগণা জিলার মহিষবাথানে হয় সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের নেতৃত্বে। কিন্তু সারা বাংলায় ও ভারতে খ্যাতিলাভ করে কাঁথির আন্দোলন। বাংলার বহু জিলা হতে আগত স্বেচ্ছাসেবকগণ, কাঁথির কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও জনগণ সরকারের নির্মম অত্যাচারের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়ান। এঁদের সবাইকে জানাই সমস্ত অন্তরের প্রীতি ও শ্রদ্ধা। কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে একত্র থেকে কঠোর পরিশ্রম করি আন্দোলনকে সফল করার জন্য। সারাদিন-রাতে ৪ ঘণ্টার বেশী বিশ্রাম পাইনি। এমন কঠোর পরিশ্রম জীবনে আর কখনো করিনি। নিয়ম মেনে চলা আমার স্বভাব। অবশ্য একথাও জানি যে, নিয়মকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করলে অন্তরদেবতা ধূলায় লুটায়। তাই বিশেষ প্রয়োজনে নিয়মের ব্যতিক্রম করতে হয়। এবার হয়েছিল তাই। এপ্রিল মাসেই (১৯৩০) প্রথম গ্রেপ্তার করে সুরেশদাকে। পিছাবনী

ক্যাম্পকোর্টে তাঁর ২ বৎসর জেল ও ৫০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে ছয় মাস জেল হয়। সুরেশদার পর এপ্রিল মাসেই আমাকেও গ্রেপ্তার করে। ঐ পিছাবনী ক্যাম্পকোর্টে আমাকেও সুরেশদার মতোই একই সাজা দেয়। কিন্তু এতদিন জেলে থাকতে হয়নি। ১৯৩১ সালে গান্ধী-আরুইন চুক্তির কিছুদিন পর আলিপুর জেল হতে মুক্তি পাই। কাঁথির এই আন্দোলনের সময় মহকুমা কংগ্রেস নেতা প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পিছাবনীর স্থানীয় নেতা ঝাড়েশ্বর মাঝির সঙ্গে খুব হৃদ্যতা হয়। তা ছিল বরাবরই। দুঃখের বিষয় এঁদের কেউ আজ জীবিত নেই।

লবণ সত্যাগ্রহের ফলে মহাত্মাজীর বাঞ্ছিত স্বরাজ লাভ হল না। পাওয়া গেল সমুদ্রতীরের লোকদের লবণ তৈরীর এবং মাথায় বা গরুর গাড়ীতে নিয়ে বিক্রী করার অধিকার।

এইবার আলিপুর জেলে বেশী লেখাপড়া করার জন্য প্রথম চশমা নিতে হয়। মেডিক্যাল কলেজের কৃতী ইংরেজ চক্ষু চিকিৎসক কর্ণেল কিরোয়াণের কাছে পাই অতি সহৃদয় ব্যবহার।

১৯৩০ সালে কোন কংগ্রেস অধিবেশন হয়নি। ১৯৩১ সালে মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে করাচীতে কংগ্রেস হয়। সভাপতি বল্লবভাই প্যাটেল। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূর করার জন্য প্রথম প্রস্তাব পাশ হয় এই কংগ্রেসে। বিশেষজ্ঞ বা বিশেষ কাজের জন্য ভিন্ন মাসিক সর্বোচ্চ বেতন হবে ৫০০ টাকা। তখন কংগ্রেসের শুভেচ্ছাসূচক প্রস্তাব পাশ করার ক্ষমতাই ছিল। আজ দেশ স্বাধীন এবং কংগ্রেস দল কেন্দ্রে এবং বহু প্রদেশে ক্ষমতায় আসীন। ধনী-দরিদ্রের দুস্তর ব্যবধান দূর হওয়া ত দূরের কথা আরো বেশী হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। করাচী জায়গাটা ভাল লাগে। করাচীতে প্রথম দেখি উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশের লালকুর্তা দলের নেতা আবদুল গফফর খানকে। এই দলের অনেক স্বেচ্ছাসেবক বা 'খোদাই খিদমতগার' (খোদার সেবক) নিয়ে আসেন

এখানে। দূর থেকে তাঁকে দেখি। পরে অবশ্য তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ হয়। বেশ হৃদ্যতা জন্মে। তাঁকে নিয়ে আসি পূর্ব বাংলায়। তাঁর নিমন্ত্রণে যাই উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশে। গফফর খান সাহেবকে সাধারণতঃ সীমান্ত গান্ধী বলা হয়। এরূপ ভাবে বেলুচ গান্ধী, বাংলার গান্ধী, বর্ধমানের গান্ধী, আরামবাগের গান্ধী প্রভৃতি বিভিন্ন লোককে বলা হয়। আমার মতে এসবই ভুল। গান্ধী একজনই, আর কেউ গান্ধী নন। গফফর খান সম্বন্ধে এই ধারণা হল যে ইনি একজন সরল ধর্মপ্রাণ লোক কিন্তু এক বিষয়ে এখানকার পাঠানদের মনোভাব দেখে দুঃখিত হলাম। পেশোয়ারে জনসভা। বক্তা জওহরলালজী। সভার কাজ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে যখন গফফর খান এলেন তখন ধ্বনি উঠল—'ফকুরে আফগান (আফগানদের গৌরব) জিন্দাবাদ'। বক্তৃতা দিতে ওঠে জওহরলালজী গফফর খান সাহেবকে 'ফকুরে হিন্দ' ধ্বনি নিয়ে স্বাগত জানাতে আহ্বান করলেন সকলকে। দুইবার সবাইকে বললেন 'বলুন ফকুরে হিন্দ জিন্দাবাদ'। শ্রোতারা মোটেই কোন সাড়া দিল না। বুঝলাম সীমান্তের পাঠানরা আফগান বলেই গৌরব বোধ করে, ভারতীয় বলে নয়। এরপর ১৯৪৭ সালে দেশভাগ হল। উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানের অংশ। গফফর খান সাহেব বহু বৎসর সরকারের বন্দী। বেদনা খুবই। ১৯৬৯ সালে গান্ধীশতাব্দী উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি ভারতে আসেন। কলকাতায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ও আলাপের সুযোগ হয়। তাঁর অদ্ভুত পরিবর্তন দেখে ব্যথিত হই। তিনি দুইটি কথা বলেন—(১) বিহারের হিন্দুদের হিংসাত্মক কাজের জন্যই ভারত ভাগ হয়েছে, (২) ভারতে সাম্প্রদায়িক হিংসাত্মক কাজ চলছে পাকিস্তানে তা নেই।" আমি তখন বলি—"আপনার এসবই ভুল কথা। বিহারের হিন্দুদের ব্যবহার খুবই নিন্দনীয়। কিন্তু পাকিস্তানের ভিত্তি মুসলিম লীগের প্রস্তাব এর পূর্বেকার। ১৯৪৬ সালে ১৬ই আগষ্ট বাংলায় প্রত্যক্ষ

সংগ্রাম দিবস, তারপর নোয়াখালিতে হিন্দুদের উপর অত্যাচার। এই সবের পর ত বিহারের ঘটনা। ভারতে সাম্প্রদায়িক হিংসাত্মক কাজ হয় তা খুবই দুঃখের ও লজ্জার। পাকিস্তানে হিন্দুরা ভীত-সন্ত্রস্ত। সংবিধান অনুযায়ী তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। কোন হিন্দু রাষ্ট্রপতি হতে পারেন না।" এবার তিনি যা বললেন তা আরো অদ্ভুত। বললেন—"তোমরা ভারতে জাকির হোসেনকে রাষ্ট্রপতি করেছিলে বটে, কিন্তু তিনি মরে বেঁচে গিয়েছেন।" আমি বলি—"ইহা সম্পূর্ণ ভুল। কলকাতায় জাকির হোসেন সাহেবের সঙ্গে আলাপে এর বিন্দুমাত্র আভাসও পাইনি।" এরূপ উক্তি ভারতবাসীর প্রতি অবিচার। গফফর খান সাহেবের মনোভাবে খুবই দুঃখিত হলাম। মনে হল তিনি আর আগেকার গফফর খান নেই।

১৯৩১ সালে গান্ধী-আরুইন চুক্তির অল্পকাল পরেই দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া আবার খারাপ হতে থাকে। মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করতে যাই সবরমতী। তিনি খুব চিন্তিত। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যাওয়া নিয়ে ইতস্ততঃ করছেন। বললেন—"জনগণের কংগ্রেসের প্রতি একটা নৈর্ব্যক্তিক শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু দেশকে স্বাধীন করার জন্য যে ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন তা করতে এখনো প্রস্তুত নয়।" অবশ্য মহাত্মাজী শেষ পর্যন্ত যান এই বৈঠকে। তাঁর সেখানকার বক্তৃতা কাগজে পড়ে অনুপ্রাণিত হই। কিন্তু চতুর বৃটিশ সরকার এই বৈঠককে সংখ্যালঘুদের দাবী আদায়ের বৈঠকে পরিণত করে। তাই মহাত্মাজী ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ডিসেম্বরের শেষের দিকে ফিরে আসেন বোম্বেতে। এখানে আজাদ হিন্দ ময়দানে দেখলাম তাঁর বিরাট অভ্যর্থনা। এরপর ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সব শুনে বুঝলাম সরকার কিছুই করতে চায় না। এমন কি, মহাত্মাজী ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেও অপমানজনক সর্ত আরোপ করে। সরকার জানায় যে, মহাত্মাজী যদি উঃ পঃ

সীমান্ত ও উত্তর প্রদেশের কংগ্রেস নেতাদের কার্য অনুমোদন না করেন তবেই সাক্ষাৎ হতে পারে এবং সে সাক্ষাতের সময়ও উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ ও বাংলার সরকার যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সে বিষয়ে কোন আলোচনা হবে না। এই সর্তে মহাত্মাজী সাক্ষাতের কথা ভাবতেই পারেন না। তা স্পষ্ট জানিয়ে দেন সরকারকে।

১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসেই মহাত্মাজী ও কংগ্রেস সভাপতিকে গ্রেপ্তার করে সরকার। তারপর চলে সারা ভারতে গ্রেপ্তার ও অত্যাচার। অস্ত্রবলে বিশ্বাসী সাম্রাজ্যবাদীদের এই নীতি। ১৯৩২ ও '৩৩ সালের প্রায় সবটাই আমিও জেলে। ১৯৩৩ সালে জুলাই মাসে জেলের বাইরে আছেন এরূপ কিছু কর্মীর সম্মেলন ডাকেন মহাত্মাজী পুনায়। আমিও তখন বাইরে—৩।৪ দিন আগেই যাই। মহাত্মাজী তখনও দুর্বল। উপবাসের জের কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তবু তাঁরই ইচ্ছায় আমার থাকার ব্যবস্থা হয় 'ভারত সেবক সমিতিতে'। এখানে থাকলে আমি উপকৃত হব এই ভাবনা নিয়ে তিনি তা করেন। অসুস্থ শরীরেও তাঁর সবদিকে নজর। আমি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিলাম। সমিতির সম্পাদক গোপালকৃষ্ণ দেওধারের অতি অমায়িক ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করে। কেরলাবাসী একজন সেবক নায়ানারের সঙ্গে হয় খুব হৃদ্যতা। দুঃখের বিষয় নায়ানার অনেকদিন আমাদের মধ্য হতে গিয়েছেন। কেরলে আমি প্রথম যাই স্বাধীনোত্তর ভারতে। খুব ভাল লাগে এখানকার নেতা কেলাপ্পানকে। নদী, উঁচু পাহাড়, সমুদ্র সব মিলিয়ে কেরালা ভারতের সবচেয়ে মনোরম স্থান। ১৯৩৪ সালে জানুয়ারী মাসে ভীষণ ভূমিকম্প হয়। তখন ছিলাম দমদম জেলে। অবশ্য ভূমিকম্পটা সবচেয়ে রুদ্ররূপে হয়েছিল বিহারে। এর কিছুদিন পরেই ছাড়া পাই জেল হতে। জেলের বাইরে যখন এলাম তখন অভয় আশ্রমের প্রধান কেন্দ্র ও সব শাখাই বে-আইনী। কোন

থাকবার জায়গা নেই বললেই চলে। এই সময়টাই ছিল জীবনের সবচেয়ে গৌরবময় দিন।

১৯৩৪ সালে অক্টোবরে বোম্বেতে নিয়মিত কংগ্রেস—সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ। এই কংগ্রেসে মহাত্মাজী চার আনার সভ্যপদ ত্যাগ করেন। কংগ্রেসে ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি প্রভৃতি এর কারণ। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সম্বন্ধে এই কংগ্রেস 'না গ্রহণ, না বর্জন' নীতি গ্রহণ করে। এর বিরুদ্ধে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও মাধব শ্রীহরি আনে কংগ্রেস জাতীয় দল গঠন করে কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরোধিতা করেন। সব সময় গান্ধী নীতি অনুসরণ না করলেও এই দুই নেতার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক মধুর ছিল। বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচনে কংগ্রেস জাতীয় দল সব কয়টি সাধারণ আসন দখল করে। নির্বাচনে আমি কোন অংশই গ্রহণ করিনি। এই কংগ্রেসে মহাত্মাজী গ্রামোদ্যোগ সংঘ গঠনের প্রস্তাব পাশ করান। এর বিরোধিতা করেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। তাঁর বক্তৃতায় ছিল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। মহাত্মাজীর ইচ্ছায় আমি এই সংঘের একজন সভ্য হই। বাংলার কাজের ভার পড়ে আমার উপর। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ জে, সি, কুমারাপ্পা হন সম্পাদক। জীবনের এক মহাসৌভাগ্য যে তাঁর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। তাঁর প্রাণে ছিল দরিদ্রের জন্য গভীর দরদ। তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা ১৯৫৯ সালে নবেম্বর মাসের শেষদিকে মাদ্রাজ হাসপাতালে। তখন তিনি নেহেরু সরকারের কঠোর সমালোচক। দুঃখের বিষয় তিনি চলে গেলেন ১৯৬০ সালের ৩০ জানুয়ারী ৬৮ বছর বয়সে। তাঁর অভাব বোধ করি আজও। জীবনে এরূপ আনন্দ পেয়েছি আরো তিনজন লোকের সঙ্গে কাজ করে:—(১) অমৃতলাল ঠক্কর বা ঠক্কর বাপা, হরিজন সেবক সংঘ ও কস্তুরবা নিধির সম্পাদক। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত এরূপ নিরলস, বুদ্ধিমান ও কর্মক্ষম ব্যক্তি জীবনে দেখিনি। (২) কিশোরলাল মশ্রুওয়ালা ও (৩) রঘুনাথ শ্রীধর ধোত্রে

গান্ধী সেবাসংঘের প্রেসিডেণ্ট ও সম্পাদক। কিশোরলালজী ছিলেন সুবক্তা। গান্ধীনীতির প্রাণস্পর্শী ব্যাখ্যাতা। ধোত্রেজী ছিলেন গান্ধী-নীতি অনুসরণকারী-কর্মীদের একত্র করে রাখার কাজে সিদ্ধহস্ত। তাঁর স্ত্রী সরযূ তাই কি চেষ্টা না করতেন আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে। আজও সে কথা মনে পড়ে। দুঃখ অনেকদিন তাঁকে দেখিনি। গ্রামোদ্যোগ সংঘের কেন্দ্রীয় অফিস হয় ওয়ার্ধায় যমুনালালজীর লোক থাকবার বাড়ী সমেত এক ফলবাগানে। মহাত্মাজী তার নাম রাখেন 'মগনবাড়ী' তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকায় ও সবরমতী আশ্রমে ডানহাত মগনলাল গান্ধীর স্মৃতি-রক্ষার্থে। মহাত্মাজী ও কুমারাপ্পা এখানে থাকতেন। এখন থেকে ওয়ার্ধা গেলে আমিও এখানেই থাকতাম।

এখন বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করি গ্রামদ্যোগ সংঘের কাজে। মহাত্মাজীর পরিকল্পনা ছিল এইরূপ—প্রত্যেক মানুষ নিজ বুদ্ধি ও সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করবে, আর প্রত্যেকে পাবে:—(১) নিম্নতম সুষম খাদ্য, (২) নিম্নতম পরিমাণ কাপড়, (৩) স্বচ্ছ বাসস্থান, (৪) অসুখ হলে সাধারণ রকমের চিকিৎসার ব্যবস্থা, (৫) প্রত্যেকের ছেলেমেয়ের জন্য কতকদূর পর্যন্ত লেখাপড়ার ব্যবস্থা, কর্তব্য ও অধিকারের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য। এই সংঘে মহাত্মাজীর সাথে কাজ করে বুঝি তাঁর উদার, বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক মনোবৃত্তি। তিনি নিজে নিরামিষাশী হয়েও বাঁকুড়ায় সংঘের তরফ হতে মাছ চাষের পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। কিন্তু একবার তাঁর বিরোধিতা করতে হয়েছিল। তিনি বোর্ডের সভায় প্রস্তাব রাখেন যে সবার আতপ চাউল খাওয়া উচিত। আমি বলি —বাপু, ইহা অবৈজ্ঞানিক। ধানের খোসার ঠিক নীচে চাউলের উপরিভাগে থাকে বেরিবেরির প্রতিষেধক ভাইটামীন বি ১। একটু বেশী ছাঁটলে ঐ ভাইটামিন প্রায় সব চলে যায়। কিন্তু ধান সিদ্ধ করলে ঐ ভাইটামিন চাউলের ভিতরে প্রবেশ করে। ছাঁটলেও

অধিকাংশ ভাইটামিন থেকে যায়। কাজেই সিদ্ধ চাউল খাওয়া যুক্তিযুক্ত। অবশ্য ভাতের ফেন ফেললে তার সঙ্গে ঐ ভাইটামিন চলে যায়। তখন বাপু তাঁর মতের সমর্থনে ডাঃ বিধান রায়ের চিঠি দেখান। আমি তখন বলি—"বাপু, ডাঃ রায় বড় ডাক্তার। কিন্তু এটি প্রাণ-রসায়ন বিজ্ঞানের কথা। তা বোধ হয় তিনি জানেন না। না জানা বশতঃ এই মত দিয়েছেন।" তখন কুমারাপ্পা বলেন বিষয়টা কুন্নুর পুষ্টি বিজ্ঞানাগারের প্রধান ডাঃ য়্যাক্রয়েডের কাছে পাঠান হোক মতের জন্য। বাপু সম্মত, আমিও। সেরূপ ব্যবস্থা হয়। ডাঃ য়্যাক্রয়েড আমার মত ঠিক বলে জানান। বাপু যে তা মেনে নেন তাই নয়, এরপর থেকে খাদ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে সব বিষয়ে আমার মত প্রথমেই নিতেন। সভার পরেই বাপুকে ডায়মণ্ড-হারবারের উৎকৃষ্ট তালগুড় একটু খেয়ে দেখতে বলি। অল্প একটু খেয়েই বলেন—"এখন তোমাকে ক্ষমা করছি সভায় আমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য।" অমনিই কুমারাপ্পা বলে উঠলেন—"এমনকি মহাত্মাদেরও ঘুষ দেওয়া যায়।" পড়ে গেল হাসির রোল। মহাত্মাজীও হাসলেন খুব।

সংঘের পরিকল্পনা ছিল গ্রামকে শুধু অন্নবস্ত্রে স্বাবলম্বী করা নয়, বেশী উৎপন্ন করে উদ্বৃত্ত শহরকে সরবরাহ করা। এ জন্য বিরাট পরিমাণে অর্থ ব্যয় করে কাজের কোন পরিকল্পনা ছিল না। সার তৈরীর কারখানার কথাও ভাবা হয়নি। গোবর, খৈল, কাঠের ছাই, হাড়ের গুঁড়া, ধঞ্চে পাতা প্রভৃতি ব্যবহার করেই উৎপাদন বাড়াবার দিকে নজর দেওয়া হয়। বাংলার একটি অতি দরিদ্র জিলা বাঁকুড়ায় বেতুড় গ্রামে পরিকল্পনা প্রয়োগকারী কর্মীদের প্রচেষ্টায় আশাতীত সাফল্যলাভ হয়। বুঝলাম বাঁকুড়ার তথাকথিত নিকৃষ্ট জমিতেও ভাল ফসল করা যায়। চাই নিষ্ঠা ও পরিশ্রম। ডাঙ্গা জমিতে প্রতিষ্ঠিত আশ্রম ফলে-ফুলে তরকারীতে হয়ে উঠল শ্রীসম্পন্ন। পুকুরে মাছ, গোপালন করে দুধ, ঘানির তেল, সবদিক দিয়ে হয়ে

উঠল আদর্শ। ১৯৩৮ সালে কর্মী সম্মেলন উপলক্ষে বেতুড়ে আসেন কিশোরলাল মশ্রুওয়ালা। সব দেখে তিনি সন্তুষ্ট। ১৯২১ সাল হতে আজ পর্যন্ত অভয় আশ্রমের সভ্য সুশীল পালিতদের গ্রাম বেতুড়। তার বিধবা মা শান্তশীলা পালিত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি যেভাবে কাজ করেন তা চিরস্মরণীয়। তাঁর পাঁচ ছেলে ও জামাই এ কাজে তাঁর উৎসাহ পায়। তিনি নৃপেনের দিদি। তাই আমরা অনেকে তাঁকে দিদি বলে ডাকতাম। দুঃখের বিষয় তিনিও আজ আমাদের মধ্যে নেই। বাঁকুড়া জিলার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট গোবিন্দপ্রসাদ সিংহের সঙ্গেও রিলিফ ও কংগ্রেসের কাজের ভিতর দিয়ে হয় অন্তরের অতি নিবিড় সম্পর্ক। তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্তও ছিল সে সম্পর্ক। অভাব বোধ করি তাঁর। কত কথা মনে আসে।

মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বাঁকুড়া ও বীরভূম জিলায় রেশম ও তসর শিল্পের প্রসারের জন্য কাজ করি। তখন চরখা সংঘ এ কাজ করত না। পরে এ কাজে হাত দেয়। হাতের তৈরী কাগজ শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য চেষ্টা করি। ঢাকা জিলার আড়িয়ল গ্রামে কাজ ভাল হয়। খেজুর ও তালগুড় তৈরীর চেষ্টা ব্যাপকভাবে করি। বেতুড়ে তাল গুড়ও হয় যা পূর্বে হত না। ১৯৩৬ সালে আমরা গঠনমূলক কর্মী সংঘ গঠন করি। সম্পাদক পঞ্চানন বসু ও সভাপতি আমি। এর প্রথম সম্মেলন হয় বীরভূম জিলার তাঁতিপাড়া গ্রামে। সেখানে গ্রামোদ্যোগ সংঘের একটি কেন্দ্র ছিল। সভাপতিত্ব করেন রাজেন্দ্র প্রসাদ। কিশোরলাল মশ্রুওয়ালাও আসেন। দুইজনের অনাড়ম্বর জীবন যাপন ও গঠনমূলক কাজের ব্যাখ্যা কর্মীদিগকে অনুপ্রাণিত করে। রাজেনবাবু সুন্দর বাংলায় বক্তৃতা দেন।

১৯৩৬ সালে পশ্চিম বাংলার কয়েকটি জিলায় বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় ধানের ফলন বেশ কম হয়। দেখা দেয় একপ্রকার দুর্ভিক্ষের অবস্থা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে অনুরোধ করি সংকট ত্রাণ সমিতির

পক্ষ হতে সেবা কাজ করতে। তিনি রাজী হন না। তখন আমরা 'পশ্চিমবঙ্গ দুর্ভিক্ষ রিলিফ কমিটি' নাম দিয়ে একটি কমিটি গঠন করে টাকার জন্য আবেদন দেই। এই কমিটির সম্পাদক প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও সভাপতি আমি। আমাদের আবেদন বের হওয়ার কিছুদিন পর সংকট ত্রাণ সমিতির সহকর্মীদের অনুরোধে আচার্য রায়ও আবেদন দেন। আমি তাঁকে গিয়ে বলি—"আপনি যখন কাজে নামছেন আমাদের কমিটি ভেঙ্গে দেই। আপনিই সেবাকার্য করুন।" তিনি বলেন—"তোমরা সেবা কাজ কর, সংকট ত্রাণ সমিতিও করুক। কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। তোমাদের কাজে আমার সহানুভূতি ও আশীর্বাদ রইল।" এবার রিলিফ করি মুখ্যতঃ কাজের মারফতে। তাতে মনে আনন্দ পাই। পশ্চিম বাংলায় বহু হাজামজা পুকুর। এদের পঙ্কোদ্ধার করলে ফসল তৈরীর জন্য সেচের ব্যবস্থা হয়, পুকুরে মাছ চাষ হয়। লোকদের আত্মমর্যাদা বাড়ে। এই ভাবে কাজ করা হয় বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলী, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জিলায়। ফল হয় ভাল। কাজের রিপোর্ট অন্য সূত্রে পেয়ে কোন খবর না দিয়ে একদিন প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার মিঃ গ্র্যাহাম আলাপ করতে আসেন। ভাল লাগল তাঁর সাদাসিধে ব্যবহার। আলাপেও খুব খুশি হলাম।

এই সময় বর্ধমানের ক্যানেল কর বাড়িয়ে একর প্রতি ৫ টাকা ধার্য করে সরকার। ক্যানেলের জলের দ্বারা কোন উপকার হয় না, কাজেই কোন ট্যাক্স দেওয়া হবে না এই আন্দোলন শুরু করে একদল লোক। আমি তখন বর্ধমান জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিকে অনুরোধ করি একটি কমিটি গঠন করে স্থির করতে ট্যাক্স দিতে হবে কিনা, দিলেও কত। কমিটি গঠিত হল। সভাপতি বিখ্যাত এটর্নী যতীন্দ্রনাথ বসু। সম্পাদক অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন। আর ৩ জন সভ্য—বিখ্যাত উকিল অতুলচন্দ্র গুপ্ত, বর্ধমান জিলা কংগ্রেসের সভাপতি যাদবেন্দ্র নাথ পাঁজা ও আমি। কমিটি

সর্বসম্মতিক্রমে একর প্রতি আড়াই টাকা ট্যাক্স দেওয়া সঙ্গত এই সিদ্ধান্ত করে। সুখের কথা তখনকার ফজলুল হক সরকার তা মেনে নেন। দুঃখের বিষয় আমাদের এই কমিটির আমি ছাড়া কেউ আজ জীবিত নেই।

গ্রামোদ্যোগ সংঘের ও এই কমিটির কাজের ভিতর দিয়ে অতুল গুপ্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। ক্রমে তা পরিণত হয় অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে। দুঃখ আজ তাঁর মূল্যবান পরামর্শ পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। অতুলবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন আর একজন আইনজীবী শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীটের কুশীপ্রসূন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সাহায্য ও পরামর্শ পেয়েছি বরাবর। তাঁর বাড়ীতে একবার ছিলাম কয়েকমাস। সমস্ত পরিবারটাই আমাকে আপন করে নেয়। দুঃখের বিষয় ১৯৬৮ সালে ১৭ই জুন চলে গেলেন কুশীবাবু আমাদের মধ্য হতে। এই বাড়ীতে মহাত্মাজী গিয়েছিলেন একদিন। গঙ্গাধররাও দেশপাণ্ডে অতিথি হিসাবে কয়েকদিন থেকে খুব সন্তুষ্ট হন। এই হৃদয়বান উদার পরিবারের সঙ্গে আমার আজও সে প্রীতির সম্পর্ক।

গঠনমূলক কর্মী সংঘ ও পশ্চিমবঙ্গ দুর্ভিক্ষ রিলিফ কমিটির কাজের ভিতর দিয়ে পরিচয় হয় মেদিনীপুর জিলার শ্রেষ্ঠ সেবক কুমারচন্দ্র জানার সঙ্গে। তিনি শুধু মেদিনীপুরের গৌরব নন সারা বাংলার। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বাসুদেবপুর গান্ধী আশ্রমে প্রথম যাই ১৯৩৭ সালে। তিনি প্রথম স্বরাজ্যদলভুক্ত ছিলেন পরে মহাত্মাজীর নীতিতে পুরা বিশ্বাসী হন। তিনি ১২ বৎসর মেদিনীপুর জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। তিনি আমার চেয়ে ২ বছরের বড় ছিলেন। ১৯৭৩ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ছিলেন আমার এক নিকটতম বন্ধু। তাঁর আগ্রহে ১৯৪৫ সালে ২৯শে ডিসেম্বর মহাত্মাজী বাসুদেবপুর আশ্রমে যান। তারপর থেকে প্রতি বৎসর কুমারবাবু ঐ দিনটি পালন করতেন—আশ্রমে জনসভায় গান্ধীজীর

জীবনী ও ভাবধারা আলোচনা করে। তাঁর অভাব খুবই অনুভব করি।

১৯৩৫ সালে কংগ্রেসের কোন অধিবেশন হয়নি। ১৯৩৬ সালে দুইবার হয় লক্ষ্ণৌ ও মহারাষ্ট্রের ফৈজপুরে। লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলাম কিন্তু ফৈজপুর যেতে পারিনি। লক্ষ্ণৌয়ে বুঝি জওহরলালজী তখন ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রের ভাবধারায় মশগুল। ফৈজপুরে প্রথম গ্রামে কংগ্রেস। প্রীতিভাজন শঙ্কররাও দেও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। অধিবেশন সুশৃঙ্খলভাবে হয়েছিল শুনে মনে খুব আনন্দ হয়। এখানে খাদি প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন মহাত্মাজী। তিনি চান সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা—একথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন। "রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থে আমি বৃটিশ পার্লামেন্টের অনুকরণ অথবা রাশিয়ার সোভিয়েত বা ইতালীর ফ্যাসিষ্ট বা জার্মানির নাৎসী শাসন চাই না। তাদের প্রতিভা অনুযায়ী তাদের দেশের শাসনব্যবস্থা—আমরা চাই আমাদের প্রতিভানুযায়ী ব্যবস্থা।" অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ—প্রত্যেকের জন্য চাই নিম্নতম সুষম খাদ্য ও প্রয়োজনীয় বস্ত্র। স্পষ্ট বুঝি মহাত্মাজী অহিংস সমাজবাদী। লক্ষ্ণৌ ও ফৈজপুর এই দুই কংগ্রেসে খাদি প্রদর্শনীর সাজসজ্জার ভার ছিল শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর উপর। ভারতীয় শিল্পের দিকে দেশের ও পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি এ বিষয়ে পথিকৃৎ। নন্দবাবু তাঁর শিষ্য। কিন্তু নন্দবাবু শিল্পী হিসাবে গুরুর চেয়ে উচ্চ আসন দাবী করতে পারেন, এই আমার ও কোন কোন বিশিষ্ট বন্ধুর মত। সুখের ও গৌরবের বিষয় ১৯৩৬ সালে কলকাতায় নন্দবাবুর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। ক্রমে হয় হৃদ্যতা ও নিবিড় সম্পর্ক। মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন উচুস্তরের। দুঃখের বিষয় তিনিও আর আমাদের মধ্যে নেই।

১৯৩৭ সালে বিধানসভার নির্বাচন হয় সারা ভারতে। বাংলায়

নির্বাচনে কোন কোন প্রার্থীর পক্ষে বক্তৃতা দিতে যাই। ঢাকা জিলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার কয়েকটি থানা এবং নবাবগঞ্জ ও দোহার নিয়ে ছিল একটি নির্বাচন কেন্দ্র। কংগ্রেসপ্রার্থী মনোরঞ্জন ব্যানার্জি। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার বিজয় চ্যাটার্জি। তিনি নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় অধিক ভোট পান, নবাবগঞ্জ ও দোহার তা পূরণ করে বেশী ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে মনোরঞ্জন বাবুকে। কিন্তু এজন্য দোহার থানায় মনোরঞ্জনবাবুর খরচ হয়েছিল মাত্র ৮০ টাকা। গঠনমূলক কর্মীদের প্রভাবের জন্যই ফল এরূপ হয়েছিল। এরূপ কম খরচে নির্বাচন হলে যোগ্য দরিদ্র প্রার্থী নির্বাচনে দাঁড়াতে পারেন। দেশে আজ সে অবস্থা মোটেই নেই।

১৯৩৭ সালে সাধারণ নির্বাচনে ছয়টি প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় এবং মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে। উড়িষ্যা এরূপ একটি প্রদেশ। এই প্রদেশ হতে গ্রামোদ্যোগ সংঘে কোন সভ্য ছিলেন না। কাজেই সেখানে সংঘের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে পরিকল্পনা দিতে হয় আমাকে। আমার পক্ষে উড়িষ্যার কাজ দেখত হরেকৃষ্ণ মহাতাব। এই সূত্রে উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বনাথ দাসের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ক্রমে তা এতটা নিবিড় হয় যে তিনি কলকাতা এলে গ্রামোদ্যোগ সংঘের অফিসে আমার সঙ্গে এক ঘরে থাকতেন। কোন খাট ছিল না। চাটাইয়ের উপর বিছানা পেতে শুতাম মেঝেতে। বিশ্বনাথবাবু আমার চেয়ে দুবছরের বড়। সুখের কথা তিনি এখনো মোটামুটি কর্মক্ষম। বাংলায় আমরা ভাবতেও পারি না যে ব্রাহ্মণ 'দাস' উপাধিধারী হতে পারে। কিন্তু বিশ্বনাথ দাস ব্রাহ্মণ। অবশ্য উড়িষ্যার গান্ধীপন্থী নেতাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে ভাল লাগে গোপবন্ধু চৌধুরীকে। গ্রামোদ্যোগ সংঘের অফিসে তাঁর সাহচর্য লাভের সৌভাগ্যও হত। তবে নূতন যুগে উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ নেতা 'উৎকলমণি গোপবন্ধু দাশ'। তিনি সত্যবাদী স্কুল প্রতিষ্ঠা করে উড়িষ্যায় নবজাগরণের সূত্রপাত করেন। ১৯১৪

সালে সত্যবাদীতে তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়। দুঃখের বিষয় এঁদের কেউ আজ জীবিত নেই। আসামে কংগ্রেস বৃহৎ দল হলেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ না হওয়ায় প্রথমে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব হয়নি। পরে অবস্থা গতিকে কংগ্রেস দলনেতা গোপীনাথ বরদলই মুখ্যমন্ত্রী হন। তিনিও বিশ্বনাথবাবুর মত কলকাতায় আমার সঙ্গে থাকতেন। দুঃখের বিষয় আসাম তথা ভারতের এই সুসন্তান অনেকদিন আমাদের ছেড়ে গিয়েছেন।

১৯৩৬ সালে গ্রামের সুবিধা-অসুবিধা আরো ভাল করে বুঝবার জন্য মহাত্মাজী মগনবাড়ী ছেড়ে ওয়ার্ধা হতে মাইল পাঁচেক দূরে 'সেগাঁও' নামক এক গ্রামে যান। যমুনালালজীর দেওয়া জমিতে একটি আশ্রম গড়ে ওঠে। গ্রামের নাম হয় সেবাগ্রাম। এই গ্রামে বাস করতে করতে মহাত্মাজীর মনে এই ধারণা জন্মে যে, চরখা সংঘ, গ্রামোদ্যোগ সংঘ, হরিজন সেবক সংঘ প্রভৃতি গঠনমূলক সংস্কার কাজ ভালভাবে করতে হলে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। তাই তিনি উদ্ভাবন করেন বুনিয়াদী শিক্ষা। তার আসল কথা:—(১) মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম, (২) চরখায় সুতা কাটা, কৃষি প্রভৃতি কোন-না-কোন উৎপাদনমূলক কাজের ভিতর দিয়ে ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, অঙ্ক ও সাধারণ বিজ্ঞান প্রভৃতির জ্ঞান দেওয়া, (৩) ৬ হতে ১৪ বছর পর্যন্ত সকল ছেলেমেয়ের জন্য ৮ বছর শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা। ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে প্রস্তাব পাশ হয়। বিষয় নির্বাচন সমিতিতে এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন আচার্য জে. বি. কৃপালনী, আর কংগ্রেসে উত্থাপন করার সৌভাগ্য হয় আমার। কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশ বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রহণ করেনি। তা করলে দেশের কল্যাণই হত এই আমার নিশ্চিত মত। বুনিয়াদী শিক্ষা চালু করতে না পারা আমাদের চরম ব্যর্থতা। এই কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র সভাপতি। হরিপুরা সুরাট জিলার একটি গ্রাম। বল্লভভাই সাড়ে সাত লক্ষ

টাকা খরচ করে জাঁকজমক সহকারে এই কংগ্রেসের ব্যবস্থা করেন। এর কঠোর সমালোচনা করেন মহাত্মাজী। তিনি বলেন যে, বল্লভভাই খাদির অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পারেনি। খুব দৃঢ়তা সহকারে বলেন যে, খাদির অর্থ বিলাসিতা বর্জন, খাদি অহিংসার প্রতীক। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বাধীনতা লাভের ২৮ বছর পরেও আজ খাদি-পরা অনেক লোক শোষণকারী বা হিংসাশ্রয়ী।

হরিপুরা কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি। কিন্তু ত্রিপুরি অধিবেশনের সভাপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় সুভাষচন্দ্র ও ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার মধ্যে। ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সভ্য ছিলেন পট্টভির পক্ষে। মহাত্মাজীও তাঁকে নাম প্রত্যাহার করতে নিষেধ করেন। এ কথা সুভাষ জানত, কিন্তু প্রতিনিধিরা জানতেন না। সুভাষচন্দ্র জয়ী হয়। ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সভ্য ইস্তফা দেন। মহাত্মাজী বিবৃতি দিয়ে বলেন—"পরাজয় ডাঃ পট্টভির চেয়ে আমার বেশী। কারণ আমি তাঁর নাম প্রত্যাহার করতে নিষেধ করি।" বাংলার সংখ্যালঘিষ্ঠ ৮০ জন প্রতিনিধি ডাঃ পট্টভিকে ভোট দেন। আমি তাদের একজন। সুভাষ-ভক্তরা এদের প্রতি অশিষ্ট আচরণ করে। ত্রিপুরি কংগ্রেস মহাত্মাজীর নেতৃত্বে আস্থা প্রকাশ করে এবং প্রেসিডেণ্ট যেন মহাত্মাজীর পরামর্শ মত ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করেন এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়। মহাত্মাজী ত্রিপুরিতে ছিলেন না। তিনি তখন রাজকোটে। সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরি প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করতে প্রস্তুত কিন্তু মহাত্মাজী জানান যে, তাঁর উপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তদনুযায়ী কাজ করা সম্ভব নয়। কারণ তাতে সুভাষের উপর ওয়ার্কিং কমিটি চাপিয়ে দেওয়া হবে। তা হবে অসঙ্গত। ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে না পেরে ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভায় সভাপতি পদে ইস্তফা দেয় সুভাষচন্দ্র এবং রাজেন্দ্র প্রসাদ সভাপতি

নির্বাচিত হন। খুবই দুঃখের ও লজ্জার কথা যে, সুভাষ-ভক্তরা রাজেনবাবুর উপরও অশিষ্ট আচরণ করে। রাজেনবাবু ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করেন তাতে আমি একজন সভ্য। এরপর সুভাষচন্দ্র 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠন করে রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে থাকে। এ কাজ হতে বিরত হতে অনুরোধ করেন রাজেনবাবু। সুভাষ তাতে কান দেয় না। ওয়ার্কিং কমিটি আগষ্ট মাসে সুভাষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে সেপ্টেম্বর মাসে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে নিমন্ত্রিত হয়ে সুভাষ যোগ দেয়। সভাকক্ষে ঢুকে সে মহাত্মাজীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। তিনিও সুভাষের পিঠ চাপড়িয়ে তাঁর আদর ও স্নেহের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন।

১৯৩৯ সালের ১৮ই এপ্রিল কলকাতাগামী ঢাকা মেল ট্রেন মাজদিয়া ষ্টেশনে এক দুর্ঘটনায় পড়ে। এই ট্রেনের এক ইণ্টার ক্লাস কামরায় ছিলাম আমি। ঐ কামরায় দুইজন কংগ্রেস এম. এল. এ. বীরেন মজুমদার ও মনোরঞ্জন ব্যানার্জিও ছিলেন। দুর্ঘটনার পর কামরা হতে বীরেনবাবুর মৃতদেহ বের করা হয়। আহত মনোরঞ্জনবাবু তার পরের দিন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। আমার সামান্য আঘাতও লাগেনি। ভগবানের অনুগ্রহ ভিন্ন কি বলব! জীবনদীপ নিভে যাওয়ার মত আরো ছয়টি দুর্ঘটনা হয়েছে জীবনে। বর্ষাকালে পদ্মানদীতে নৌকাডুবি, হাওয়াই জাহাজে উড়তে যেয়ে মাঠে ঢুকে পড়া, দুইটি মোটর গাড়ী ও দুইটি জীপ দুর্ঘটনা—ভগবানের অপরিসীম অনুগ্রহে একটিতে সামান্য আঘাত পেয়েছিলাম মাত্র।

ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য হওয়ার পর প্রথম সভাতেই জওহরলালজীর সঙ্গে তর্ক-বিতর্কের সময় তিনি গরম মেজাজ দেখান। আমি তাঁকে বলি—"আমি ইংরেজ অফিসারদের সঙ্গেও কাজ করেছি। তাঁরা ত এরূপ গরম মেজাজ দেখাননি। এই কি ওয়ার্কিং কমিটির রীতি!

তাহলে আমিও সেই পথ অনুসরণ করব।" জওহরলালজী বলেন—"অফিসারদের মধ্যে সিনিয়ার জুনিয়ার ছিল। এখানে আমরা সবাই সমান। তাই এরূপ করতে পেরেছি।" এ যুক্তি আমার কাছে ঠিক মনে হল না। একেলা মহাত্মাজীকে বলি—"বাপু, জওহরলালজী যেরূপ রেগে যান তা কি বংশগত?" বাপু—"হাঁ, পণ্ডিত মতিলাল রাগে একেবারে টগবগ করতেন।" "বাপু, আমিও রাগী লোক।" বাপু—"আমি ত তার পরিচয় পাইনি।" আমি বলি —"আপনি পাবেন কি করে। যারা পাবার তারা পায়।" বাপুর সঙ্গে আমার যে কথা হয়েছিল তা তিনি জওহরলালজীকে বলেছিলেন কিনা জানি না। যে কারণেই হোক, এরপর জওহরলালজী আমার সঙ্গে কোন দিন গরম মেজাজ দেখাননি। ক্রমে তাঁর সঙ্গে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্বাধীনোত্তর যুগে রাজনৈতিক মতভেদ সত্ত্বেও তা অটুট ছিল। তিনি ছিলেন ভাবপ্রবণ লোক। সভায় অনেক কথা ঝোঁকের মাথায় বলতেন। সভার পরেই তার অনেকটা ভুলে যেতেন। তবে তিনি জেনে বুঝে কখনো মিছে কথা বলতেন না। যুক্তি দিতে না পারলে নিজের জেদ বজায় রাখার জন্য কাজ করতেন না। নিজের ভুল বুঝলে তা স্বীকার করতেন। দুঃখের বিষয় তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা ছিল না। তিনি গান্ধী-নীতি অনুসরণ করেননি কিন্তু কখনো গান্ধীজী হতে বিচ্ছিন্ন হতে চাননি। তিনি নিজেকে ভারতের চেয়ে ইংলণ্ডে অধিকতর নিজের ঘরে রয়েছেন বলে মনে করতেন।

১৯৪০ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলাদেশে গান্ধী সেবা সংঘের অধিবেশন হয়। আমি প্রথম কুমারচন্দ্র জানাকে অনুরোধ করি, মেদিনীপুর জিলার কোন স্থানে তা করতে। তিনি অক্ষমতা জানান। তখন মালিকান্দায় পদ্মার ধারে তা করা স্থির হয়। অবশ্য কুমার-বাবু তাঁর কয়েকজন সহকর্মী নিয়ে আসেন এখানে। দুঃখের বিষয় প্রফুল্লচন্দ্র সেন বাংলায় গান্ধী সেবা সংঘের অধিবেশন হওয়া বিষয়ে

সহমত থাকলেও সে, ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখার্জি ও অতুল্য ঘোষ মালিকান্দায় আসেওনি বা অধিবেশনের সাফল্যের জন্য বিন্দুমাত্র কিছু করেনি। কিন্তু ডাঃ আশুতোষ দাস, পঞ্চানন বসু, রতনমণি চ্যাটার্জি, সুধীরচন্দ্র লাহা প্রভৃতি হুগলীর নেতারা এসে যথাসাধ্য করেন। দুঃখের বিষয় হুগলীর এই নেতারা কেউ আজ জীবিত নেই। অধিবেশন আরম্ভের ৭ দিন পূর্বে কলকাতায় সুভাষ আমাকে ফোনে বলে—"এ সময় মহাত্মাজীর আসাটা বন্ধ কর।" আমি বলি—"এই শেষ মুহূর্তে কার্যক্রম বাতিল করা অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ মহাত্মাজী আসছেন গঠনমূলক কাজের প্রসারের জন্য, তোমার রাজনৈতিক কাজের বিরোধিতার জন্য নয়। আর মহাত্মাজীর ত নিজের মত বলবার অধিকার আছে। আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করছি মালিকান্দায় এসো। জনসভায় মহাত্মাজী বলবেন, তুমিও তোমার মত বলবার পূর্ণ সুযোগ পাবে।" তখন সুভাষ নরম সুরে শুধু একথা বলে—"জনসাধারণ এখন উত্তেজিত, কিছুদিন পরে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এখন স্থগিত রেখে তখন নিয়ে এলেই ভাল হবে।" আমি তাতে সম্মত হই না। এই কথাবার্তার ঘণ্টা দুই পরে সেবাগ্রাম হতে মহাদেব ভাইয়ের ফোন পাই। সুভাষ এ সময় মহাত্মাজীর আসা বন্ধ করতে ফোন করেছিল এ কথা জানান। সুভাষের সঙ্গে ফোনে আমার যে কথা হয়েছিল তা সব বলি তাঁকে। সুভাষকে মালিকান্দায় নিমন্ত্রণ করেছি শুনে মহাত্মাজীর সব দ্বিধা চলে গিয়েছে এবং তিনি আসছেন এ খবর দেন মহাদেব ভাই। মহাত্মাজী আসেন, সঙ্গে কস্তুরবা। সুভাষ-ভক্ত বলে পরিচয়-দানকারী কিছু লোকের অশিষ্ট ও হিংসাত্মক আচরণ সত্ত্বেও অধিবেশন খুব সফল হয় এবং মহাত্মাজীও সন্তুষ্ট হন। এরপর পাটনায় সদাকত আশ্রমে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে এই অধিবেশনের ব্যবস্থাদির প্রশংসা করেন। এ কৃতিত্ব বাংলার গঠনমূলক কর্মীদের। ১৯৪০ সালে মার্চ মাসে বিহারে রামগড় কংগ্রেস—সভাপতি মৌলানা আজাদ। এই কংগ্রেসের

অব্যবহিত পূর্বে পাঞ্জাবের এক সময়কার বিখ্যাত ছোটলাট স্যার মাইকেল ওডায়ার লণ্ডনে এক ভারতীয়ের গুলিতে নিহত হন। স্যার মাইকেল ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবে ভীষণ অত্যাচারের জন্য বেশ দায়ী। এরূপ লোকের হত্যারও তীব্র নিন্দা করেন মহাত্মাজী। এই ছিল তাঁর অহিংসার রূপ। তিনি অহিংসার উপর জোর দিতে থাকেন। কারণ অহিংস আবহাওয়াতেই সংগ্রাম সম্ভবপর। তাঁর ধারণা তখন নিশ্চিত যে, সংগ্রাম অনিবার্য। দীর্ঘ ছয় বছর পর এবার তিনি কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচন সমিতির সভ্য ও প্রতিনিধিদের কাছে বক্তৃতা দেন। ১৯৭০ সালের ১১ই অক্টোবর ওয়ার্কিং কমিটির সভায় তাঁর ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের পরিকল্পনা পেশ করেন এবং তা গৃহীত হয়। এবার তিনি নিজে প্রথম সত্যাগ্রহ করবেন না। তিনি নিজে দেখেশুনে সারা ভারতের সত্যাগ্রহীর তালিকা তৈরী করবেন এ জন্য সত্যাগ্রহী নির্বাচনে কড়াকড়ি সত্ত্বেও এক বছরে সারা ভারতে ২৫ হাজার সত্যাগ্রহী দণ্ডিত হন। 'যুদ্ধের কাজে যোগ দিও না, এ জন্য টাকা দিও না' এই বক্তৃতা দিয়ে সত্যাগ্রহীরা গ্রেপ্তার হত। গ্রামোদ্যোগ সংঘের সভ্য থেকে আইন অমান্য করা যায় না। তাই সভ্যপদ ছেড়ে দেইএবং বাসুদেবপুর গান্ধী আশ্রমের সামনে কুমারবাবু ও আমি আইন অমান্য করি। মেদিনীপুরে বিচারে দুই জনেরই এক বছর করে জেল হয়। আমাকে মেদিনীপুর হতে নিয়ে আসে আলিপুর জেলে।

এবারে প্রথম সত্যাগ্রহী হন বিনোবা ভাবে। মহাত্মাজী সম্ভাব্য সত্যাগ্রহীদের মধ্যে তাঁকে সর্বাধিক অধ্যাত্মময় মনে করেন। বিনোবাজী অল্পসংখ্যক গান্ধী অনুগামীর কাছে সুপরিচিত হলেও এবার সারা ভারত জানল তাঁর কথা। বিনোবাজী পরে মহাত্মাজীর 'সব ভূমি গোপালকী' এই মতের বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য ভূদান, গ্রামদান, জিলাদান প্রভৃতি আন্দোলন করেন। তাঁর প্রচারের জোরে ভূদানকর্মীরাই শুধু সর্বোদয় কর্মী আখ্যা পান। ইহা

অযৌক্তিক। সর্বোদয় শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন মহাত্মাজী। তিনি রাজনীতি করতেন। আমি মনে করি সত্য ও প্রেম-ভিত্তিক রাজনৈতিক ও গঠনমূলক কর্মী সবাই সর্বোদয় কর্মী, শুধু ভূদান কর্মীরা নন। আমি প্রথম ভূদান অন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হই। ১৯৫৭ সালের পর এই আন্দোলনে আস্থা হারাই। মনে করি এর দ্বারা জনকল্যাণ হবে না। তবে প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে বিরোধিতা করি না। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে গান্ধীনিধির অছি মণ্ডলীর সভায় স্পষ্ট বলি যে, গান্ধীনিধির সম্পাদক বলছেন এই প্রতিষ্ঠানের তরফ হতে কাজ ভাল হচ্ছে, বিনোবাজী বলছেন ভূদান আন্দোলন ভাল চলছে, সরকার বলছে পরিকল্পনার কাজ ভাল চলছে, অথচ দেশের শতকরা ৯৮ জন নিম্নতম সুষম খাদ্য পায় না। কাজেই কোথাও আমাদের ত্রুটি রয়েছে। আত্মপ্রশংসা না করে ত্রুটি কোথায় তা বের করা দরকার। এই সভায় জওহরলালজী উপস্থিত ছিলেন। একথা আজ স্পষ্ট যে, বিনোবাজীর আন্দোলনের দ্বারাও জনকল্যাণ হয়নি। ভগবান আমাদের সকলকে ঠিকপথে পরিচালিত করুন, এই প্রার্থনা।

আলিপুর জেলে থাকাকালে ১৯৪১ সালে ৭ই আগষ্ট কবিকুলগুরু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। আমরা জেল হতে তার করে শোকবার্তা জানাই। জেলে আসার পূর্বে অসুস্থ কবিকে দেখতে শান্তিনিকেতন গিয়েছিলাম। কবি জন্মেছিলেন বাংলাদেশে, লিখেছিলেন বাংলা ভাষায়। কিন্তু তিনি সমস্ত বিশ্বের সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে। তিনি আজ পর্যন্ত জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক প্রতিভা। পশ্চিমবাংলায় সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম বাংলাভাষা করলে তাঁকে যথোচিত শ্রদ্ধা দেখান হবে। সে শুভবুদ্ধি হোক সবার, এই প্রার্থনা সর্বনিয়ন্তার কাছে।

এদিকে যুদ্ধের অবস্থা মিত্রশক্তির পক্ষে ক্রমে খারাপ হয়। ভারত সরকার সকল আইন অমান্যকারীদের ছেড়ে দেয় ১৯৪১

ডিসেম্বরে। মুক্তির পর এই মাসের শেষভাগে ওয়ার্কিং কমিটির সভা হয় বরদৌলীতে। এই আমার প্রথম বরদৌলী দেখা। বেশ ভাল লাগে এখানকার আশ্রমের ব্যবস্থা। লাভজনক চাষের বিশেষ করে কলা চাষের অবস্থা দেখে খুব আনন্দ পাই। এরপর ১৯৪২ জানুয়ারী মাসে ওয়ার্ধায় রাষ্ট্রীয় সমিতির সভায় মহাত্মাজী ঘোষণা করেন যে, জওহরলাল তাঁর উত্তরাধিকারী। একথাও বলেন যে, তাঁর জীবিত কালে জওহরলাল তাঁর বিরোধিতা করলেও তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাষায়ই কথা বলবে। বাপুর এ আশা মোটেই ফলবতী হয়নি। আর বাপুর এ ঘোষণা গণতন্ত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। এর পরের দিন মগনবাড়ীতে কুমারাপ্পা আমার সামনেই বাপুকে বলেন—"বাপু, আপনার আছে কি ? কিসের উত্তরাধিকারী হবেন জওহরলালজী। আপনার ত আছে দুইটি জিনিস—(১) এক লেঙ্গটি ও (২) লাঠি। এই দুইটির একটিও গ্রহণ করেন না জওহরলালজী।" বাপু খুব হাসলেন, আমরাও।

ফেব্রুয়ারী (১৯৪২) জাপানী সৈন্য ব্রহ্মদেশে পোঁছে। মার্শাল চিয়াং কাইশেক সস্ত্রীক ভারতবর্ষে আসেন। ১৮ই কলকাতার বিড়লা ভবনে তাঁরা মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা চলে যাওয়ার পরই বাপুকে জিজ্ঞাসা করি কি বুঝলেন ? উত্তরে বলেন —"চীনী মন দুর্জ্ঞেয়।" ৭ই মার্চ জাপানীরা রেঙ্গুন অধিকার করে। জাপান ভারতের দুয়ারে। ২২শে মার্চ স্যার ষ্ট্র্যাফোর্ড ক্রীপস্ বৃটিশ মন্ত্রিসভার একটি প্রস্তাব নিয়ে দিল্লী আসেন। প্রস্তাব দেখে মহাত্মাজী তাঁকে বলেন—"এই প্রস্তাব নিয়ে আপনি কেন এসেছেন ? আপনাকে প্রথম প্লেনে দেশে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি।" ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের তাঁর মত জানিয়ে মহাত্মাজী দিল্লী হতে চলে যান। ওয়ার্কিং কমিটি কয়েকদিন আলোচনা করে ক্রীপস্ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। এই সময় ভারতের উপর জাপানের আক্রমণ আসন্ন বলে মনে হয় অনেকের। মহাত্মাজী ভাবেন ইংরেজ যদি ভারত

ছেড়ে যায় তবে স্বাধীন ভারতকে জাপানের আক্রমণের সম্ভাবনা খুব কম। তাই 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের প্রস্তাব দেন ওয়ার্কিং কমিটির সামনে। এরূপ আন্দোলন না হলে এমন কি একদল ভারতবাসীও জাপানকে সাহায্য করতে পারে বলেন তিনি। জওহরলালজী এই প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে এতে হিটলার-গোষ্ঠীকে শক্তিশালী করা হবে এবং তা হবে জগতের পক্ষে অকল্যাণকর। মৌলানা ও আরো কয়েকজন জওহরলালজীকে সমর্থন করেন। কিন্তু অধিকাংশ সভ্য মহাত্মাজীর প্রস্তাবের পক্ষে। অধিকাংশ সভ্য চান ইংরেজ ও অপর সব সাম্রাজ্যবাদের অবসান। পৃথিবীর সকল দেশ স্বাধীন হোক এই তাঁদের কথা। জুলাই মাসে ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটিতে বিরোধিতা হলে মহাত্মাজী বলেন যে, বিরোধিতা থাকলে তিনি কংগ্রেসের তরফ হতে আন্দোলন পরিচালনা করবেন না। করবেন নিজ দায়িত্বে যারা তাঁর মত ঠিক মনে করে তাঁদের নিয়ে। এরপর জওহরলালজী বিরোধিতা হতে বিরত হন, অন্যান্যরাও। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করার জন্য আগস্ট মাসে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভা ডাকা হয় বোম্বেতে। ৮ই আগষ্ট রাত্রিতে 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গৃহীত হয় এই সমিতিতে। মাত্র ১৩ জন এর বিরোধিতা করে। তারা কমিউনিষ্ট। তাদের কাছে রুশিয়া যুদ্ধে যোগ দেওয়ার পূর্বে এটা ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, রুশিয়া যোগ দেওয়ার পর তা জনযুদ্ধ। প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর রাত ভোর হতে-না-হতেই অর্থাৎ ৯ই আগষ্ট অতি ভোরে মহাত্মাজী, ওয়ার্কিং কমিটির বোম্বেতে উপস্থিত সভ্যদের বোম্বের মেয়র মেহের আলী ও কিছু বিশিষ্ট লোককে গ্রেপ্তার করে। এঁদের ট্রেনে নিয়ে যায় বোম্বে হতে। গ্রেপ্তারের সময় ছিলাম গ্রামোদ্যোগ সংঘের সভ্য স্যুরজী বল্লভ দাসের স্যাণ্ডহার্ষ্ট রোডের 'কচ্ছ কাচলে'। কয়েক বছর যাবৎই এই বাড়ী হয়েছিল যেন আমার বোম্বের বাড়ী। স্যুরজী ভাইয়ের গুণেই তা হয়। 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার মত

জেনে বিপদের ঝুঁকি নিয়েও আমাকে তাঁদের বাড়ীতে রাখেন। দুঃখের বিষয় সুরজী ভাই আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু এই উদার পরিবারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আজও তেমনি মধুর। মহাত্মাজী, সরোজিনী নাইডু, মীরাবেন, মহাদেব দেশাইকে পুণা স্টেশনে নামিয়ে নিয়ে যায় আগাখাঁ প্রাসাদে। পরে কস্তুরবা ও ডাঃ সুশীলা নায়ারকে সেখানে নিয়ে যায়। ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদেরও কমিটির সভায় নিমন্ত্রিত একজনকে নিয়ে মোট ১২ জনকে নিয়ে যায় আমেদনগর। এঁদের বন্দী করে রাখে আমেদনগর ফোর্টে। এঁরা হলেন—আবুল কালাম আজাদ, জওহরলাল নেহেরু, বল্লভভাই প্যাটেল, জীবতরাম ভগবানদাস কৃপালানী, পট্টভী সীতারামিয়া, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, শঙ্কর দত্তাত্রেয় দেও, আসফ আলী, সৈয়দ মামুদ, হরেকৃষ্ণ মহাতাব, নরেন্দ্র দেব ও প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। এই প্রথম বাংলার বাইরে কোন জায়গায় বন্দী আমি। প্রথম দিনেই বুঝি বোম্বে সরকারের অযোগ্যতা ও হৃদয়হীনতা। মহারাষ্ট্রের জেলখানা হতে কয়েকজন কয়েদী নিয়ে এসেছিল আমাদের রান্না ও অন্য সব কাজের জন্য। প্রথম দিনই রান্না করার লোকটি বলে যে, সে ভাত রান্না করতে বা আটার রুটি তৈরী করতে জানে না, শুধু বাজরীর রুটি তৈরী করতে জানে। তখন বোম্বে সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব একজন ভারতীয় আই. সি. এস. এবং কারাসমূহের ইনস্পেক্টার জেনারল একজন ভারতীয় আই. এম. এস.। প্রথম দিকে একমাত্র শঙ্কররাও এই কয়েদীদের ভাষা বুঝত। সে ভার নেয় এদিগকে কাজ শিখাবার ও কিছু কিছু রান্না করার। মাস পাঁচেক পরে সে ভার নেই আমি। কিছুদিন পর জওহরলালজী প্রাতরাশের ব্যবস্থার ভার নেন। এক বছর পর রান্নার কাজের ভার নেয় মহাতাব। কৃপালানীজী মাঝে মাঝে বিশেষ রান্না করতেন। আমেদনগরের আবহাওয়া শুকনো বলে আমরা কেউ কেউ বাইরে উঠানে শুতাম। তবে বন্দীশালার দেওয়াল এত উঁচু ছিল যে, সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত দেখতে পেতাম না।

এই ছিল আমার মনে সবচেয়ে বড় দুঃখ। প্রথম কিছুদিন আমাদের কোন চিঠি আসতে বা যেতে দিত না। কোন খবরের কাগজও দিত না। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার চেষ্টা ছিল সরকারের। যখন চিঠি লিখবার বা পাওয়ার অনুমতি হল তখনও সব চিঠি আসত যেত বোম্বে সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিবের মারফতে। এই ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত ছিল। কিন্তু বন্দী করার দুই মাসের মধ্যে দেশের লোক জানত আমরা কোথায় আছি। প্রথম যেদিন খবরের কাগজ পাই সেদিন জানতে পারি মহাদেব দেশাইয়ের মৃত্যুর কথা। সবাই খুব দুঃখিত।

এই বন্দীনিবাসে খুব কর্মব্যস্ত জীবন কাটাতাম। দৈনিক ২৫-৩৬ নম্বরের অন্ততঃ এক হাজার গজ সুতা কাটতাম। দৈনিক ৪-৫ ঘণ্টা লেখাপড়া করতাম। রান্নার কথা পূর্বেই বলেছি। তাস খেলতাম ১-১½ ঘণ্টা। ব্যাডমিণ্টন, ভলিবলও খেলতাম। 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস' শেষ করি এখানে। বল্লভভাইয়ের কাছে গুজরাটি শিখি। দিন কাটছিল বেশ। জওহরলালজী, ডাঃ পট্টভি, কৃপালানীজী, শঙ্কর রাও, মহাতাবও বেশ কাজ করতেন। বল্লভভাই, পন্থজী ও নরেন্দ্র দেব শারীরিক অসুস্থতার জন্য কাজ করতে পারতেন না। প্রথম দিকে জওহরলালজী রোজ খানিকটা সুতা কাটতেন। শেষের দিকে সুন্দর ফুলের বাগানও করেছিলেন।

১৯৪৪ সালে ২২শে ফেব্রুয়ারী কস্তুরবার মৃত্যু হয় আগাখাঁ প্রাসাদে। খুবই দুঃখ হয় মনে। তিনি আমাদের অনেকের কাছে 'মা'র মত ছিলেন। তাঁর স্নেহপ্রবণ প্রাণের তুলনা মিলা ভার। কোন কোন বিষয়ে তাঁকে মহাত্মাজীর চেয়েও বড় মনে হয়েছে আমার। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে দেশবাসী ৮০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে ২রা অক্টোবর মহাত্মাজীর হাতে তুলে দেয়। পরে আরো সংগ্রহ হয়ে হয় ১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা। এই টাকা গ্রামের সকল বয়সের মেয়ে ও

ছোট ছেলেদের কল্যাণের জন্য। তা 'কস্তুরবা নিধি' নামে সুপরিচিত।

১৯৪৪ সালের জুন মাসে কঠিন পেটের অসুখে আক্রান্ত হই। বন্দী নিবাসের সুপারিণ্টেনডেণ্ট মেজর সেণ্ডাক (এম. ডি. লণ্ডন—আই. এম. এস.) আমাকে আরোগ্য করার জন্য যথাসাধ্য করছিলেন। কিন্তু রোগ উপশম না হয়ে আরো বেশী অসুস্থ হই। ডিসেম্বর মাসে স্বাস্থ্যের কারণে আমাকে মুক্তি দেয়। বন্দীনিবাসের কারাপাল নিজে এসে আমাকে পেঁৗছে দিয়ে যায় বোম্বেতে বন্ধুবর ডাঃ ভূপেশ দাশগুপ্তের বাসায়। ভূপেশ তখন বোম্বে করপোরেশনের হেলথ অফিসার। বোম্বের খ্যাতনামা ডাক্তার গিল্ডার আমার চিকিৎসার ভার নেন। তাঁর সুচিকিৎসায় ও ভূপেশের স্ত্রী তরুর সেবা-যত্নে দুই সপ্তাহের মধ্যে অনেকটা ভাল হয়ে উঠি। সমস্ত অন্তরের ধন্যবাদ ডাঃ গিল্ডারকে। তরুকে আর কি ধন্যবাদ দিব! সে ভূপেশের স্ত্রী, আর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু সুরেশ সেনের ছোট বোন। তাকে ছোট থাকতেই জানি এবং ছোট বোনের মত মনে করি। তাকে জানাই স্নেহ, ভালবাসা ও আশীর্বাদ। ভূপেশ, সুরেশ আজ জীবিত নেই, কিন্তু তারা আমার কাছে চিরজীবিত। তরু কলকাতায় বেশ কিছুদিন ভগ্নস্বাস্থ্য ও শয্যাগত। দুঃখ হয় মনে। অসুস্থ অবস্থায় বন্দী-শালার বিশিষ্ট সাথীদের কাছে যেরূপ প্রীতি ও ভালবাসা পেয়েছি তা জীবনে ভুলতে পারি না। দুঃখের বিষয় তাঁদের মধ্যে কৃপালানীজী ও মহাতাব ভিন্ন আর সবাই আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

বোম্বে থাকতে বন্ধুবর বালাসাহেব খের (বোম্বের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী) ও অন্যান্য বিশিষ্ট কংগ্রেসসেবীর কাছ থেকে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার ফ্র্যান্সিস মুডির ওয়ার্কিং কমিটিকে ডিঙ্গিয়ে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলনেতা ভুলাভাই দেশাইকে দিয়ে মহাত্মাজীর সমর্থনে কিছু করার কথা শুনি। কিন্তু মহাত্মাজী

ওয়ার্কিং কমিটিকে ডিঙ্গিয়ে কিছু করার কথা কখনো ভাবেননি। এ কথা বুঝবার পর ভারত সরকার এ অপচেষ্টা বন্ধ করে।

শরীর খানিকটা ভাল হলে সেবাগ্রাম আসি মহাত্মাজীর কাছে। তাঁকে আমেদনগরের সব খবর দেই। তিনিও ভুলাভাইকে তাঁর লিখিত পত্র ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র দেখান। গুজরাটী চিঠিখানা স্পষ্ট কিন্তু ইংরেজী চিঠির দুই অর্থ হতে পারে বলি। তিনি সেই দিনই লোক মারফত ভুলাভাইকে চিঠি দিয়ে জানান যে, তাঁর ইংরেজী চিঠির অর্থ গুজরাটী চিঠির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করতে হবে।

সেবাগ্রাম হতে আসি কলকাতায়। ননীদি ও যমুনা তখন কলকাতায় এক বাসা করে থাকলেও বন্ধুবর জিতেন্দ্রমোহন দত্তের ইচ্ছায় তাঁর বাসায় কয়েক দিন থাকি। পরে থাকি যমুনাদের কাছে। শরীর সারতে থাকে ধীরে ধীরে। আমি এখন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের চিকিৎসাধীন। তিনি ডাঃ গিল্ডারের রোগ নির্ণয় ঠিক মনে করেন। ধন্যবাদ তাঁকেও। মাস তিনেক গেলে লেখাপড়ার কাজে ব্যস্ত থাকতাম। সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাসকে নিয়ে আসেন এক বন্ধু। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস-এর পাণ্ডুলিপি পড়ে সন্তুষ্ট হন। ক্রমে সজনীবাবুর সঙ্গে হয় হৃদ্যতা। দুঃখের বিষয় তিনিও অনেকদিন আমাদের মধ্যে নেই।

১৯৪৫ সালে কুমার জানা জেল হতে বেরিয়ে দেখা করতে আসেন। মহাত্মাজীর 'গীতাবোধ' বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন তা দেখে দিতে বলেন। অনুবাদ মূল গুজরাটী হতে নয়, হিন্দী অনুবাদ হতে। আমি তাঁকে বলি গুজরাটী হতেই এর অনুবাদ হওয়া উচিত। তিনি আমাকে অনুরোধ করেন তা করতে। তা করি এবং দুই জনের যুক্ত নামে তা ছাপা হয় ১৯৪৬ সালে।

১৯৪৫ সালে জার্মানীর পরাজয়ের পর ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের মুক্তি দেয় সরকার। এরপর ভাইসরয়ের সিমলা কনফারেন্সের সময় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক সেখানে হয়। পুরাপুরি সুস্থ না হলেও যাই।

সঙ্গে গ্রামোদ্যোগ সংঘের কর্মী সুধেন্দু দাশগুপ্ত। সে বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দী ভাল জানে, তদুপরি সর্টহ্যাণ্ড, টাইপরাইটিং। তার সেবাভাবও ছিল বেশ। আমাদের থাকার ব্যবস্থা ছিল হোটেলে। ডাঃ পট্টভি, কৃপালানীজী এবং শঙ্করাও-ও ছিলেন একই হোটেলে। সুধেন্দু তাঁদের কাজও করত। সবাই সন্তুষ্ট তার কাজে। মহাত্মাজী ছিলেন রাজকুমারী অমৃত কাউরের বাড়ীতে। রোজই মাছের কিছু-না কিছু খাবার তৈরী করে পাঠাতেন রাজকুমারী আমার জন্য। দুঃখের বিষয় তিনিও আমাদের মধ্যে নেই।

সিমলা কন্‌ফারেন্সের ফল কিছু হল না। এ জন্য দায়ী জিন্না সাহেবের অযৌক্তিক জেদ এবং ইংরেজ সরকারের তাঁকে সমর্থন।

১৯৪৫ সালে মহাত্মাজী আসেন বাংলায়। শারীরিক কারণে তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারিনি। শুধু যাই রামপুরহাট।

ননীদি ও যমুনা বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ করছিলেন। ১৯৪৬ জানুয়ারী মাসে তাঁদের সদ্য আরম্ভ করা বলরামপুর কেন্দ্র দেখতে যাই। তাঁদের কাজে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেই। বুদ্ধি পরামর্শ ছাড়া প্রায় এক লক্ষ টাকা তুলে দেই।

১৯৪৬ সালে মহাত্মাজী ও ঠক্কর বাপার ইচ্ছানুসারে কস্তুরবা নিধির বাংলা প্রাদেশিক বোর্ডের সভাপতি হই। নদীয়া জিলার সাহেবনগর গ্রামে কৃষিশিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রথম শিক্ষণ শিবির হয়। পরে প্রাদেশিক বোর্ড না রাখাই স্থির হয়। সঞ্চালিকা কেন্দ্রীয় অফিসের নির্দেশমত কাজ করবেন এরূপ ব্যবস্থা হয়। প্রথম হতেই সঞ্চালিকা ননীদি। দশ বছরের বেশী কেউ সঞ্চালিকা থাকতে পারেন না এই নিয়ম। ননীদির পর যমুনা হয় সঞ্চালিকা। আজ অন্য একজন। যমুনা কস্তুরবানিধির অছিমণ্ডলীর একজন।

১৯৪৬ সালে তিনটি বিশেষ ঘটনা ঘটে। ১৬ই আগষ্ট কলকাতায় মুসলীম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস উপলক্ষে হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, খুন-জখম। এরপর অক্টোবর মাসে নোয়াখালী

জেলায় ভীষণ অত্যাচার হয় হিন্দুদের উপর। সংলগ্ন ত্রিপুরা জেলার এক অংশেও কিছু। কৃপালানীজী সস্ত্রীক আসেন নোয়াখালী। তখন বুঝি সুচেতা দেবী বেশ কর্মক্ষম ও নির্ভীক। মহাত্মাজীও ২৮শে অক্টোবর দিল্লী হতে কলকাতায় আসেন নোয়াখালী যাওয়ার জন্য। এরপর বিহারে মুসলমানদের উপর অত্যাচার হয়। জওহরলাল, বল্লভভাই, লিয়াকৎ আলী খান, রাজেন্দ্র প্রসাদ, কৃপালানী, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী, মৌলানা আজাদ, আব্দুল গফফর খান যান বিহারে। ঠিকই করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় একজন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় মুসলিম নেতা নোয়াখালী যাননি। নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ৭৭ বছরের ভগ্নস্বাস্থ্য বৃদ্ধ মহাত্মাজী নোয়াখালী যান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনবার জন্য। দুঃখের বিষয় শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়ায় তাঁর সঙ্গী হতে পারিনি। ৩রা ডিসেম্বর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই শ্রীরামপুর গ্রামে ; তখনও যা চলছে বলে শুনি তা সব বলি তাঁকে। তিনিও সব কথা খুলে বলেন। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কাজ করে যেতে হবে, ভরসা ভগবান বলেন তিনি। প্রেরণা নিয়ে ফিরে আসি। নবেম্বরে মীরাটে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে তিনি যাননি। ১৯৪৭ সালের ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা-দিবসেও তিনি দিল্লী যাবেন না বলেন। কারণ তিনি মনে করেন যে, জনগণের মুখে হাসি না ফুটলে তাঁর আনন্দ করার সময় নয়। আজও তাঁর বাঞ্ছিত হাসি ফুটেনি!

যুদ্ধের দরুণ নির্বাচন বন্ধ ছিল। ১৯৪৬ সালে তা হয়। তাতে কংগ্রেস অংশ গ্রহণ করে। বাংলার নির্বাচন বোর্ডের সভাপতি শরৎচন্দ্র বসু ও সম্পাদক আমি। দুইটি সর্ত করে আমি সম্পাদক হই :—(১) শরৎবাবু, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, কিরণশঙ্কর রায় ও আমি এই চারজনের কেউ প্রাদেশিক বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উপরে আপিল করবেন না, (২) এঁদের কেউ টাকা তুলে ব্যক্তিগত ভাবে কাউকে দিবেন না।

সব টাকা বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খরচ করা হবে। সুখের কথা চারজনই এই দুইটি সর্ত মেনেছিলেন। এবারই শরৎবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম দায়িত্বপূর্ণ কাজ। খুব প্রীতিকর অভিজ্ঞতা হয়। তাঁর সঙ্গে হয় একটা মধুর সম্পর্ক। আজও তাঁর ব্যক্তিগত আচরণের কথা মনে করে আনন্দ পাই। কিন্তু একটি বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ হয়। একটি ধনী পরিবার কয়েক লক্ষ টাকা দিতে চান জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের নির্বাচনের জন্য। এর ফল অকল্যাণকর তাই আমি এ ব্যাপারে জড়িত থাকতে চাই না। কিরণবাবুও থাকেন না। সবচেয়ে উৎসাহী সুরেনবাবু। সমস্ত ভার নেন মৌলানা আজাদ, শরৎবাবু ও সুরেনবাবু। প্রার্থীরা অবশ্য কেউ কংগ্রেসের নামে দাঁড়ান না। টাকার যথেষ্ট অপব্যবহার হয়। জয়লাভ করেন মাত্র পাঁচ জন। তাঁরাও কেউ কংগ্রেসের সঙ্গে কাজ করেন না।

আর একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা হয় মৌলানাকে নিয়ে। আমাদের বোর্ড হতে কিছু টাকা নেন তিনি প্রার্থীদের জন্য। আমি ও প্রাদেশিক বোর্ডের কোষাধ্যক্ষ সীতারাম সাকসেরিয়া তাঁকে বলেও কোন হিসাব পাই না। কেন্দ্রীয় বোর্ডের কোষাধ্যক্ষ বল্লভভাইকে হিসাব দিবেন বলেন। তাও দেন না। সব শুনে বল্লভভাইও অসন্তুষ্ট। এই সালেই ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে আলোচনার সময় আর একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা হয় মৌলানাকে নিয়ে। ঐ সময় ওয়ার্কিং কমিটিতে স্থির হয়েছিল যে, মিশনের সঙ্গে আলোচনাকালে মহাত্মাজী বা ওয়ার্কিং কমিটির কোন সভ্য যে চিঠি লিখেন মিশনের কারো কাছে তা পাঠাবার পূর্বেই আর সম্ভব না হলে যথাসম্ভব শীঘ্র কমিটিকে জানান হবে। স্যার ষ্ট্র্যাফোর্ড ক্রীপস্‌কে মৌলানা এই মর্মে একখানা চিঠি লিখেন যে, যদিও কংগ্রেস চায় যে, তার মনোনীত একজন মুসলমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় থাকবেন তবু এর উপর আপোস প্রস্তাব ভেঙ্গে দেওয়া হবে না। ক্রীপসের কাছে এই চিঠির কথা শুনে মহাত্মাজী ওয়ার্কিং কমিটিতে কথা ওঠান।

মৌলানা ঐরূপ কোন চিঠির কথা অস্বীকার করেন। তখন ক্রীপস চিঠিখানা মহাত্মাজীকে পাঠান দেখবার জন্য। মৌলানার এরূপ আচরণে মহাত্মাজী খুব ব্যথিত। এই অবস্থায় মৌলানার পদত্যাগ করা উচিত ছিল। না করলে ওয়ার্কিং কমিটির তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা উচিত ছিল। তা হল না। মহাত্মাজী ও ওয়ার্কিং কমিটি দেখালেন দুর্বলতা। তার ফল ভুগছে সারা দেশ।

নির্বাচনের পর বাংলাদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করে মুসলীম লীগ। ভারতের এগারটি প্রদেশের মধ্যে আটটিতে হয় কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব। আগষ্ট মাসে লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণার পর ভাইসরয় জওহরলালজীকে কেন্দ্রে মন্ত্রিসভা গঠন করতে নির্দেশ দেন। ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ জওহরলাল-মন্ত্রীসভা শপথ নেয়। তখন লীগের কেউ এতে যোগ দেন না। পরে অক্টোবর মাসে প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে কথা না বলে ভাইসরয়ের ইঙ্গিতে যোগ দেন। অবাক হয়ে যাই যখন দেখি লীগের মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন বাংলার তপশিলী সম্প্রদায়ের যোগেন্দ্র মণ্ডল। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে, দেশ ভাগের কিছু পরে এই যোগেন মণ্ডলকে পশ্চিম বাংলায় আশ্রয় নিতে হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসেই বুঝি যে ভারত ভাগ নিশ্চিত। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী য়্যাটলির ঘোষণায় খোলাখুলি না বললেও তা সুস্পষ্ট। জুন মাসে ভাইসরয় ঘোষণা করেন যে, ভারত হিন্দু-প্রধান ও মুসলমান-প্রধান এই দুই অংশে বিভক্ত হবে। পাঞ্জাব এবং বাংলা এইরূপ ভাবে ভাগ হবে। উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ এবং আসামের শ্রীহট্ট জেলায় গণভোট হবে। কিন্তু রাজস্থানের সংলগ্ন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সিন্ধু দেশের থারপারকারে গণভোট হল না। কর্তব্য স্থির করার জন্য জুলাই মাসে দিল্লীতে ওয়ার্কিং কমিটি ও রাষ্ট্রীয় সমিতির সভা ডাকা হয়। ওয়ার্কিং কমিটিতে মহাত্মাজী স্পষ্ট বলেন যে,

স্বাধীনতা লাভ দশ বছর পিছিয়ে গেলেও দেশ ভাগ মেনে নেওয়া উচিত নয়। দেশ ভাগ হিন্দু-মুসলমান কারো পক্ষেই কল্যাণকর নয়, সবারই ক্ষতিকর। আরো বলেন যে, বিভক্ত ভারতের দুই অংশ বৃহৎ শক্তিদের চক্রান্তের কেন্দ্র হবে। পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব সুরু হয় ফেব্রুয়ারী মাসে। জুনে তা আরো ভীষণ আকার ধারণ করে। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যা শুনি তা হতে মনে হয় মানুষ পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম প্রাণী। অসংখ্য লোক হতাহত হয়। পঃ পাঞ্জাব, উঃ-পঃ সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু দেশ হতে প্রায় সব হিন্দু ও শিখ বিতাড়িত হয়, আর পূঃ পাঞ্জাব হতে বিতাড়িত হয় প্রায় সব মুসলমান। ওয়ার্কিং কমিটি মনে করে যে, এরূপ চলতে থাকলে দেশের ধ্বংস অনিবার্য। আর জওহরলাল, বল্লভভাই দুইজনেই জোর দিয়ে বলেন যে, লীগের লোকদের সঙ্গে একযোগে কাজ করা অসম্ভব। হয়তো ভাগ হলে শান্তি ফিরে আসবে। তারা তাদের অংশের উন্নতির জন্য কাজ করবে, আর আমরা করব আমাদের অংশের জন্য। ফলে দুই অংশেরই উন্নতি হবে। দেশ ভাগ হল, কিন্তু এই শুভ আশা মোটেই ফলবতী হয়নি। রাষ্ট্রীয় সমিতির সভায় পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন দেশ ভাগ অনুচিত এই মর্মে এক সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। তা অগ্রাহ্য হয়। দেশ ভাগ হল। তা হল মস্ত বড় ভুল। জীবনে অনেক ভুল করেছি কিন্তু দেশ ভাগ করার অংশীদার হওয়ার মত মহাভুল হৃদয়ে শেলের মত বিঁধে রয়েছে। বাংলা ভাগ যখন নিশ্চিত অভয় আশ্রমের কর্মীদের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করে স্থির হয়, যে যেখানে আছেন সে সেখানেই থাকবেন। কিন্তু কারো জন্মস্থান অন্য অংশে হলে ইচ্ছা করলে সে অংশে যেতে পারেন। সুখের কথা বিশিষ্ট কর্মীদের কারো বেলায় এর ব্যতিক্রম হয়নি। আমি তখন কলকাতায়। পশ্চিম বাংলার কাজের সঙ্গেই অধিকতর যুক্ত। এখানকার সহকর্মীদের ইচ্ছায় পঃ বাংলা বিধানসভার দলনেতা

হতে রাজী হই। সুরেন্দ্রমোহন ঘোষও নেতা হতে চেয়েছিলেন। কৃপালানীজী তখন কংগ্রেস সভাপতি। তিনি এরূপ স্থির করেন যে, বিধানসভার কংগ্রেস দলের সভ্যদের তিনি নিজে জিজ্ঞাসা করবেন। যার পক্ষে বহুমত তাকেই সর্বানুমতিক্রমে নেতা নির্বাচিত করা হবে। প্রকাশ্য কোন বিরোধিতা হবে না। সুরেনবাবু ও আমি এ প্রস্তাবে রাজী হই। বহুমত আমার পক্ষে হওয়ায় দলের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আমি নেতা নির্বাচিত হই। নেতা হয়ে প্রথমেই সুরেনবাবুকে মন্ত্রিসভার একজন সদস্য হতে অনুরোধ করি। তিনি রাজী হন না।

পূর্ব বাংলার বিধানসভার লীগ দলনেতা নির্বাচন হয় কলকাতায় বিধানসভা কক্ষে। দুইজন প্রার্থী শহীদ সুরাবর্দি ও খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন। দলপতি নির্বাচিত হন নাজিমুদিন সাহেব। নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই তাঁকে মাল্যভূষিত করে অভিনন্দন জানাই। পূর্ব-বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে অনেক ব্যাপারে যোগাযোগ হয়েছে। ফলে একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাঁকে একজন ভদ্রলোক বলে মনে করি। কোন কথা দিলে তা রাখতেন। তাঁর এক উদার ভাবের অভিব্যক্তি চিরদিন মনে রয়েছে। ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকায় যাই মহাত্মাজীর চিতাভস্ম নিয়ে। তখন আমি মন্ত্রী নই। খবর দিয়েছিলাম নাজিমুদ্দিন সাহেবকে। তিনি আসেন ঢাকা বিমান বন্দরে। আমাকে বলেন—"ইসলাম এরূপ স্মৃতিরক্ষায় বিশ্বাসী নয়, তবে আপনাদের মনোভাবের প্রতি মর্যাদা দেখাতে আমার পক্ষে যা করা সম্ভব তা করতে প্রস্তুত।" এই ত চাই। নিজ ধর্মে আস্থা, অপরের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব। লাঙ্গলবন্ধে যেয়ে চিতাভস্ম বিসর্জন দেই। পূর্ব বাংলার শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিরা সেখানে একটি গান্ধীঘাট তৈরী করে। আমি যত গান্ধীঘাট দেখেছি তার মধ্যে বদরীনাথের ঘাট আমার কাছে সব চেয়ে ভাল লেগেছে।

বাংলা ভাগ হওয়ার পূর্বে কংগ্রেস, মুসলীম লীগ ও ভারত

সরকারের মধ্যে এই স্থির হয় যে, ভাগের পূর্বেই পশ্চিম বাংলা বিধানসভা দলনেতা তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে বাংলার মন্ত্রিসভার সঙ্গে যুক্ত হবেন ছায়া মন্ত্রিসভা হিসাবে। তাঁদের মতের বিরুদ্ধে পশ্চিম বাংলার জন্য কোন কাজ হবে না। অবশ্য সব বিষয়ে আদেশ দেওয়ার ভার থাকবে যুক্ত বাংলার লীগমন্ত্রিসভার উপরই। এই মন্ত্রিসভার সঙ্গে ছায়া মন্ত্রিসভার মতভেদ হলে আপোষ করার ভার প্রথম গভর্ণরের। প্রয়োজন হলে ভারত সরকারের কাছে তা উপস্থিত করা যেতে পারে। সুখের বিষয় ভারত সরকারে যেতে হয়নি। লীগ মন্ত্রিসভাকে দিয়ে ঠিকঠিক কাজ করিয়ে নেওয়া নিতান্ত সহজ ছিল না। ৩রা জুলাই ছায়া মন্ত্রিসভার শপথ নেওয়ার দিন থেকে ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত ছিল আমার জীবনের বড় পরীক্ষার দিন। যেদিন লীগ মন্ত্রিসভার সঙ্গে প্রথম বসি সুরাবর্দি সাহেব আমাদের বলেন— "আমাদের সঙ্গে কাজ করে বুঝতে পারবেন আমাদিগকে যতটা খারাপ মনে করা হয় আমরা ততটা খারাপ নই।" আমি বলি "অল্পকালই আমরা একসঙ্গে কাজ করব। এমনভাবে যেন কাজ করি যাতে বন্ধুভাবে পৃথক হতে পারি। প্রত্যেক প্রস্তাব যেন তার গুণাগুণের উপর বিচার করি।" আমার এই কথার ফল ভাল হয়। লীগ মন্ত্রিসভার কোন কোন মন্ত্রী কোন কোন সময় সুরাবর্দি সাহেবের মত সমর্থন না করে আমার মত সমর্থন করেছেন। গভর্ণর ফ্রেডারিক ব্যারোজও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। ধন্যবাদ এঁদের সবাইকে।

আমাদের সামনে বড় সমস্যা দেখা দেয় সরকারী কর্মচারীদের নিয়ে। ভারত সরকার অবিভক্ত বাংলার সকল কর্মচারীকে পূর্ব বাংলায় অথবা ভারত তথা পশ্চিম বাংলায় কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশের অধিকার দেয়। অধিকাংশ কর্মচারী হিন্দু। তারা প্রায় সবাই ভারত তথা পঃ বাংলায় কাজ করতে চায়। আমাদের মন্ত্রিসভাও সর্বসম্মতিক্রমে তাদিগকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করে। ভাল হত যদি

যে যেখানে আছে সে সেখানে থাকবে শুধু অন্য অংশে বাড়ী হলে সেখানে যেতে পারবে ভারত সরকার এরূপ নির্দেশ দিত।

পঃ বাংলা নূতন প্রদেশ। কে গবর্ণর হবেন সে প্রশ্ন ওঠে। আমি প্রথম শ্রেণীর তিনজন রাজনীতিবিদের নাম করি যেন তাঁদের মধ্য হতে একজনকে পাঠান হয়। জওহরলালজীর ইচ্ছা ছিল অন্য একজনকে পাঠাবার। কিন্তু আমার প্রস্তাব শুনেই সে নাম বাদ দেন। আমার প্রস্তাবিত তিনজনের মধ্যে একজন এক প্রদেশের গবর্ণর হবেন ঠিক হয়েছে জানান। আর একজনাকে কেন পাঠান যাবে না বলেন। তা আমার কাছেও যুক্তিযুক্ত মনে হয়। এখন বাকী রইল শুধু রাজাজীর নাম। তিনি তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। প্রথম অস্বীকার করেন পরে আমার ব্যক্তিগত অনুরোধে রাজী হন। এজন্য তাঁকে জানাই আমার অন্তরের অভিনন্দন। সত্যিই তাঁকে একজন শুভাকাঙ্ক্ষী ও সুপরামর্শদাতা রূপেই পেয়েছিলাম।

শাসনদণ্ড পরিচালনায় এর আগে আমার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। জনগণের কল্যাণবুদ্ধি, সততা ও কঠোর পরিশ্রম এই সম্বল করে চললে ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব এই ছিল আমার ধারণা। দ্বিতীয় ধারণা এই ছিল যে, মুখ্য সচিব ও আরো কয়েকজন সচিব নিয়োগ যদি ঠিক হয় তবে মন্ত্রিসভার নীতি কার্যকরী করা সহজ হবে। তাই সব শাসন ও বিচার-বিভাগের উচ্চ কর্মচারীদের গোপন রিপোর্ট পড়ি। বিচার বিভাগ হতে ৪ জনকে নিয়ে আসি সচিব হিসাবেঃ—(১) সুকুমার সেন (মুখ্য সচিব), (২) করুণাকুমার হাজরা (মন্ত্রী-প্রধানের একান্ত সচিব), (৩) রণজিৎ গুপ্ত (স্বরাষ্ট্র সচিব), শৈবালকুমার গুপ্ত (শিক্ষা সচিব)। এই সব নিয়োগ যে ভাল হয়েছিল তা সন্দেহাতীত। যে নিষ্ঠাসহকারে এরা কাজ করেছিল তা প্রশংসার যোগ্য। দুঃখের বিষয় সুকুমার ও করুণা দুইজনই আমাদের মধ্যে নেই। এদের মৃত্যুতে নিতান্ত আত্মীয়-বিয়োগ ব্যথা অনুভব করেছি। এরা সবাই আই. সি. এস.। এদের

কাজে সন্তুষ্ট হলেও বল্লভভাইয়ের উক্তি—"আই. সি. এস.-রাও কংগ্রেসের লোকের মতই দেশপ্রেমিক" আমার মতে ভ্রান্ত। যেমন ভ্রান্ত বল্লভভাই সম্বন্ধে জন গান্থারের "Inside Asia" (এশিয়ার অভ্যন্তরে) নামক বইয়ে একজনের উক্তি বলে উদ্ধৃত—'His only culture is agriculture'—"তাঁর একমাত্র কৃষ্টি কৃষি" অর্থাৎ তাঁর কৃষ্টি নীচুস্তরের। নামধারী কংগ্রেসী তখনও ছিল এখন ত ঢের বেশী। সে কথা বিবেচনা করেও বলছি বল্লভভাইয়ের উক্তি ভ্রান্ত।

১৯৪৭ সালে ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে বলা হত 'প্রাইম মিনিষ্টার' আর প্রদেশের মন্ত্রী-প্রধানদের বলা হত 'প্রিমিয়ার'। এতে ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা ছিল। তাই আমার পর প্রিমিয়ার না বলে মুখ্যমন্ত্রী বলা হত। তা ঠিকই।

ছায়া মন্ত্রিসভায় থাকাকালে একদিন দুপুরের পর লোক মারফত মহাত্মাজীর একখানা চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে যাই। তাতে ছিল এই যে, সর্দারের ইচ্ছা পশ্চিম বাংলা মন্ত্রিসভায় একজন মাড়োয়ারী নেওয়া হোক—বদরীদাস গোয়েঙ্কা বা দেবীপ্রসাদ খৈতান। এর মাত্র কয়েকদিন আগে মন্ত্রীদের নাম অনুমোদন করিয়ে আনি। অনুমোদনকারীদের মধ্যে ছিলেন একজন সর্দারও। তখন এমনকি তিনি একলাও এ বিষয়ে আমাকে কিছু বলেননি। মন্ত্রিসভায় একজন মাড়োয়ারী থাকতেই হবে ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক মনে হয়। প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে চিঠির কথা বলি। সে বদরীদাস গোয়েঙ্কাকে নিতে বলে। কিন্তু মন কিছুতেই সায় দেয় না। মহাত্মাজী কানে শুনতে পান না। তাই কৃপালানীজীকে ফোনে সব কথা বলি। তিনি মহাত্মাজীকে গিয়ে সব বলেন। মহাত্মাজী তাঁকে বলেন—"প্রফুল্ল যদি প্রস্তাব সঙ্গত মনে না করে তবে ধরে নিতে পারে যে আমি তাকে এই চিঠি লিখিইনি।" এইখানেই বাপুর মহত্ব। এই চিঠি প্রকাশের কোন ইচ্ছাই ছিল না আমার। এর প্রায় দশ বছর পরে ১৯৫৭ সালে নির্বাচনের সময় তমলুকে এক জনসভায় আমার প্রথম মন্ত্রিসভার

বিরুদ্ধে কথা বলা হয়। তখন আমি এই চিঠির উল্লেখ করি এক জনসভায়। তারপর অতুল্য ঘোষ বিবৃতি দেয় যে, মহাত্মাজী এরূপ কোন চিঠি লিখেননি। তখন নিতান্ত বাধ্য হয়ে এই চিঠি খবরের কাগজে ছাপান হয়।

এখানে একথা স্পষ্ট বলে রাখতে চাই যে, মাড়োয়ারী বলেই আমার কারো উপর কোন বিরূপ ভাব নেই। আমার ইচ্ছানুসারে পশ্চিম বাংলা বিধানসভার স্পীকার বা সভাপাল হন ঈশ্বরদাস জালান, একজন মাড়োয়ারী। তিনি খুব যোগ্যতার সঙ্গে সে কাজ করেন। যোগ্য লোককে যোগ্য স্থান দিয়েছিলাম, মাড়োয়ারী বলে নয়। আর আমার মত এই ছিল যে, পশ্চিম বাংলার বর্তমান অধিবাসী তার জন্ম ভারতের যেখানেই হোক না কেন সে পশ্চিম বাংলায় যার জন্ম তার মত সুখ-দুঃখের সমভাগী হবে। একথা জনসভায়ও বলতাম। ছায়া মন্ত্রিসভায় বা পশ্চিম বাংলার প্রথম মন্ত্রিসভায় কোন মুসলমান ছিলেন না। কারণ তখন বিধানসভায় কোন কংগ্রেসভাবাপন্ন মুসলমান ছিলেন না। এজন্য আমাকে কেউ কিছু বলেননি। আমি বরাবরই মনে করি একজন সৎ ও যোগ্য হিন্দু মন্ত্রী সকল সম্প্রদায়েরই কল্যাণ করতে পারেন। তেমনি পারেন একজন সৎ ও যোগ্য মুসলমান মন্ত্রী। সম্প্রদায় নির্বিশেষে সৎ ও যোগ্য লোককে যোগ্যস্থান দিতে হবে এই আসল কথা। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মন্ত্রী থাকতেই হবে এ নীতি সাম্প্রদায়িক ব্যাধি চিরস্থায়ী করার অপব্যবস্থা মাত্র। যাতে মুসলমানদের উপর কোন অবিচার না হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতাম আমি নিজে। কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি মত তাদের কোন অন্যায্য দাবী রক্ষা করিনি।

স্বাধীনতা লাভের দিন (১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭) মহাত্মাজী কলকাতায়। নোয়াখালী যাওয়ার জন্য কয়েকদিন আগে কলকতায় আসেন। কিন্তু মুসলমান নেতাদের অনুরোধে থেকে যান এখানে। সেদিন যেরূপ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভিব্যক্তি দেখেছি জীবনে আর কোন-

দিন সেরূপ দেখার সৌভাগ্য হয়নি। সারা শহরে অভূতপূর্ব সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা জানিয়ে দেখতে যেতে অনুরোধ করি মহাত্মাজীকে। তিনি সানন্দে রাজী হন। বেশ কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে দেখাই। দেখে বললেন—"এ সবই ভগবানের অনুগ্রহে সম্ভব হয়েছে।" আমার মনে হয় ভগবান দেখিয়ে দিলেন মানুষের মধ্যে শুভবুদ্ধি জাগ্রত হলে কি হতে পারে। আজ সেটা স্বপ্ন, কিন্তু সুখ-স্বপ্ন। এর মাত্র দুই দিন পরেই এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ১৪ই আগষ্ট মুর্শিদাবাদ ও মালদহ শহরে পাকিস্তানী পতাকা তোলা হয়। আর ১৫ই আগষ্ট খুলনায় ভারতীয় পতাকা তোলা হয়। দুই বাংলার সীমানা নির্ধারণের ভারপ্রাপ্ত র‍্যাডক্লীফ সাহেবের রায় বেরোয় ১৭ই। সে অনুযায়ী খুলনা জিলা যায় পূর্ব পাকিস্তানে, আর মুর্শিদাবাদ ও মালদহ শহর সহ ঐ দুই জিলার খানিক অংশ হয় পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত। দুই বাংলায় থমথমে ভাব। আমি উদ্যোগী হয়ে স্যার নাজিমুদ্দিন ও আমার নামে একটি যুক্ত বিবৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করি। তার সারমর্ম ছিল যে, র‍্যাডক্লিফ রায়ের পরিবর্তনের যা দরকার তা হবে দুই বাংলার মধ্যে আলোচনার মারফতে। যতক্ষণ সেরূপ কিছু করা না হয় ঐ রায় মেনে চলতে বলি জনগণকে। বল্লভভাই এই বিবৃতি পছন্দ করেন না। কেন এই বিবৃতি দিয়েছি জিজ্ঞাসা করেন। আমি বলি—"এই বিবৃতি দিয়ে বাংলাকে রক্ত-পাতের হাত হতে বাঁচিয়েছি। নইলে বাংলার অবস্থা পাঞ্জাবের মত হত।" বিরক্তির সুরে বল্লভভাই বলেন—"হোতা ত ক্যায়া হোতা!" আমি বলি—"সে কথা আপনি বলতে পারেন, আমি পারি না।" মহাত্মাজী প্রকাশ্য সভায় কলকাতায় আমাদের বিবৃতিকে বিজ্ঞজনো-চিত আখ্যা দেন। ভারত সরকার র‍্যাডক্লিফ রায়ের বিবেচনার জন্য পাঁচজনের এক কমিটি গঠন করেন, তা হয় নিরর্থক। ফল কিছুই হয় না।

খুব এক কঠিন সময় পশ্চিম বাংলার শাসনভার পড়ে আমাদের

উপর। তিনটি সমস্যা ছিল প্রধান:—(১) খাদ্য-সমস্যা, (২) সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও (৩) দুর্নীতি। সরকারী গুদামে তখন মাত্র কয়েকদিনের খাদ্য ছিল। জাহাজ হতে মাল আসত আর তাড়াতাড়ি সরবরাহ স্থানে পাঠাতে হত। পূজা সামনে, এই অবস্থায় যদি প্রদেশের ভিতর হতে কিছু চাউল সংগ্রহ করা না যায় তবে বিপদের সম্ভাবনা। এই সময় চাউল সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য তথাপি আমাদের চেষ্টায় প্রায় একলক্ষ মণ চাউল সংগৃহীত হয়। কিন্তু বিপদ আসে কংগ্রেসী ট্রেড ইউনিয়ন নেত্রী ডাঃ মৈত্রেয়ী বসুর কাছ থেকে। পূজার মাত্র কয়েকদিন আগে এসে বলেন যে, খাদ্য-সরবরাহ বিভাগের মোটর চালকদের এক মাসের মাইনে অগ্রিম দিতে হবে। আমি বলি যে, যদি আরো দু সপ্তাহ পূর্বে বলতেন তাহ'লে সমবেতনের সকল কর্মচারীর অগ্রিম দেওয়ার ব্যবস্থা করতাম। কিন্তু অন্যদের বাদ দিয়ে শুধু এই মোটর চালকদের অগ্রিম দেওয়া হবে একদলের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, অতএব অসঙ্গত। এরপর কোন নোটিশ না দিয়ে একদিন সকালে খাদ্য-সরবরাহ বিভাগের মোটর চালকরা কাজ বন্ধ করে। ধর্মঘটীদের ছাড়িয়ে দিয়ে তাদের স্থানে নূতন লোক নিযুক্ত করতে আরম্ভ করি। বেসরকারী লরীর মালিকদিগের গাড়ীচালক দিয়ে সাহায্য করতে আবেদন করি। বেশ সাড়া পাওয়া যায়। চাপ দিয়ে অন্যায়ভাবে উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই সময় সরবরাহ মন্ত্রী চারুচন্দ্র ভাণ্ডারীর কাজ বেশ প্রশংসনীয়।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা এক মস্তবড় কাজ। মুসলমানরা যাতে পশ্চিম বাংলায় শান্তিতে বাস করতে পারে তার জন্য যথাসাধ্য করি। যেখানে যাওয়া দরকার যাই। পূজা, কোরবানি, তাজিয়া, মিছিল ইত্যাদি ব্যাপারে কর্তব্য স্থির করার জন্য কলকাতায় ৮নং থিয়েটার রোডে আমার সরকারী বাসস্থানে স্যার নাজিমুদ্দিন, আমি, কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ

প্রেসিডেণ্ট একত্র বসি। আলোচনার পর স্থির হয় যে, ইংরেজ আমলে যে ব্যবস্থা চলছিল বর্তমানে তাই চলবে। পূজা, কোরবানি ইত্যাদি ঠিকভাবেই অনুষ্ঠিত হয় দুই বাংলায়।

মহাত্মাজী ত বরাবরই তাঁর নিজস্ব ধারায় চেষ্টা করছিলেন। তিনি সুরাবর্দি সাহেবকে তাঁর সঙ্গে এক বাড়ীতে থেকে ঐক্যের কাজে সাহায্য করতে অনুরোধ করেন। তিনি তাতে রাজী হন। ১৩ই আগষ্ট হতে তাঁরা বেলেঘাটায় এক মুসলমান ভদ্রলোকের পরিত্যক্ত বাড়ীতে যেয়ে বাস করতে আরম্ভ করেন। প্রথম দিন একদল লোক সুরাবর্দি সাহেবকে নিয়ে একটা বিরুদ্ধ মনোভাব দেখায়। দ্বিতীয় দিন হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়। এর পরের দিন কলকাতার সর্বত্র সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভিব্যক্তি। তার উল্লেখ পূর্বে করেছি। কিন্তু পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার খবর যত আসতে থাকে তত আবহাওয়া গরম হয় কলকাতায়। একদল লোক পাঞ্জাবের প্রতিশোধ নিতে চায়। তাদের মতে এর প্রধান প্রতিবন্ধক মহাত্মাজী। তাই ৩১শে আগষ্ট রাত্রিতে তাঁর বাসস্থানের উপর হামলা করে। রাতদুপুরে পুলিশ কমিশনার সহ সেখানে যাই এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেই। সুখের বিষয় কোন শক্তি প্রয়োগ করতেই হয়নি। পরের দিন ১লা সেপ্টেম্বর মহাত্মাজীর নোয়াখালী যাওয়ার কথা ছিল। তা বন্ধ হল। তাঁর সেখানে আর যাওয়া হয়নি। ১লা সেপ্টেম্বর রাত সোয়া আটটার সময় হতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য তিনি উপবাস আরম্ভ করেন। সম্প্রীতি ফিরে এলে উপবাস ভঙ্গ করবেন বলেন। এর ফল হল অদ্ভুত। যে সব যুবক তাঁর বাসস্থানে উপদ্রব করেছিল তারা এসে অনুশোচনা প্রকাশ করে। বহু যুবক তাঁর কাছে নানাবিধ মারাত্মক অস্ত্র জমা দেয়। সরকারের তরফ হতে ঘোষণা করা হয় যে, একটা নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে অস্ত্র জমা দিলে তাদের এই অস্ত্র রাখার অপরাধে কোন শাস্তি দেওয়া হবে না। হিন্দু,

মুসলমান, শিখ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট লোকদের লিখিত প্রতিশ্রুতি পেয়ে ৭৩ ঘণ্টা পরে ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত সোয়া নয়টায় মহাত্মাজী উপবাস ভঙ্গ করেন। দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক অশান্তির খবর পেয়ে ৭ই সেখানে রওনা হন। এবার মাস খানেক মহাত্মাজী বাংলায় ছিলেন। এর মধ্যে কলকাতা শহর, ব্যারাকপুর, কাঁচড়া-পাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। সারা বাংলাদেশ বিশেষ করে আমাদের মন্ত্রিসভা এ জন্য তাঁর কাছে ঋণী। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে আমার কাজ অনেক হালকা করে দিয়েছিলেন তিনি।

এই সময় একদল ছাত্র ও যুবক যেভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করে তা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করি। 'শান্তিসেনা' গঠন করে তারা খুব ভাল কাজ করেছিল। মহাত্মাজী শান্তিসেনাদের উপদ্রুত অঞ্চলে যেয়ে জীবনের পরওয়া না করে কাজ করতে উপদেশ দেন। এই কাজে ৩রা সেপ্টেম্বর উচ্চ শিক্ষিত যুবক শচীন মিত্র মৃত্যুবরণ করেন। পরে এরূপ আরো তিনজন যুবক—স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর ঘোষ ও সুশীল দাশগুপ্ত জীবন বিসর্জন দেন। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এই জীবনদান এক মহৎ দৃষ্টান্ত। এঁরা সবাই অমর। শ্রদ্ধা জানাই এঁদের।

দুর্নীতি বন্ধের ব্যাপারে আমি বিশেষভাবে মনোযোগ দিই। আমি তখনও মনে করতাম এবং এখনও করি যে, জাতির অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় দুর্নীতি। স্বাধীনতা লাভের পর লোকের মনে একটা নূতন প্রেরণা এসেছিল। তাই ভাবি এই প্রকৃষ্ট সময় দুর্নীতি রোধের। বিলম্বে ফল লাভের আশা কম। পুরা উদ্যমে কাজে লেগে যাই। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট কৃপালানীজী ও গবর্ণর রাজাজীর পুরা সমর্থন ছিল আমার পেছনে। মুখ্যসচিব সুকুমার সেনও ছিল খুব উৎসাহী। সরকারী ও বেসরকারী বহু লোকের সাহায্য পাই। অবশ্য একদল লোকের চক্ষুঃশূলও হই।

১৫ই আগষ্টের পরই পশ্চিম বাংলার সব রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। পূর্ব বাংলার এরূপ বন্দীদের ছেড়ে দিতে অনুরোধ করি নাজিমউদ্দিন সাহেবকে। খুনের অভিযোগে দণ্ডিত ভিন্ন আর সবাইকে ছাড়তে রাজী হন। আমি বলি যে, খুনের অপরাধে দণ্ডিতদের আমি পশ্চিম বাংলায় নিয়ে যেতে রাজী যদি তিনি সেখানে তাদের বাইরে রাখতে না চান। তাতে তিনি রাজী হন না। তখন প্রস্তাব দিই যে, এদের সমস্ত কাগজপত্র একজন হাইকোর্ট জজের কাছে পাঠান হোক। পরিবর্তিত অবস্থায় তিনি যাদের ছেড়ে দিতে বলেন তাদের ছেড়ে দিন। প্রস্তাবে তিনি রাজী হন। অতএব পূর্ব বাংলার সব রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির ব্যবস্থা তখন করা গেল না। একসঙ্গে সবাই মুক্তি পেলে সুখী হতাম। আমি মনে করি গণতন্ত্রের দুইটি রক্ষাকবচ :—(১) ন্যায়নিষ্ঠ পাবলিক সার্ভিস কমিশন, (২) সম্পূর্ণ স্বাধীন, সৎ যোগ্য বিচার-বিভাগ। সার্ভিস কমিশনে এমন লোক থাকা উচিত নয় যিনি সেখানকার কোন বিভাগে সচিব হয়েছেন। আর বিচার বিভাগেও এমন লোক থাকা উচিত নয় যিনি একবার এম. এল. এ., এম. পি. বা মন্ত্রী হয়েছেন। এরূপ লোক নিযুক্ত হলেই যে তাঁরা অন্যায় কাজ করবেন তা নয়, তবে লোকমনে একটা সন্দেহ হতে পারে। সে অবকাশও দেওয়া উচিত নয়। সার্ভিস কমিশন নিয়োগের প্রশ্ন ওঠে। অবসরপ্রাপ্ত জিলা জজ বি. কে. বসু, বিজ্ঞানী ডঃ নীলরতন ধর ও অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক জিতেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগীকে সদস্য হতে অনুরোধ করি। তাঁরা রাজী হন। পরে ডঃ ধর অক্ষমতা জানান। তাঁর স্থলে আর এক বিজ্ঞানী ডঃ সুধাময় ঘোষকে অনুরোধ করি। তিনি রাজী হন। আমার পরামর্শক্রমে গবর্ণর রাজাজী বি. কে. বসু চেয়ারম্যান, ডঃ সুধাময় ঘোষ ও অধ্যাপক নিয়োগী সদস্য এই তিনজনের সার্ভিস কমিশন নিযুক্ত করেন। হাইকোর্ট জজ নিয়োগের প্রশ্ন ওঠেনি আমাদের কাছে। তবে কতজন জজ

প্রয়োজন প্রশ্ন ওঠে। অবিভক্ত বাংলায় জজ সংখ্যা ছিল ২২। আমি বলি পশ্চিম বাংলার জন্য ১৩ জনই যথেষ্ট। কলকাতার জন্য ৭ জন আর প্রদেশের বাকী অংশের জন্য ৬ জন। প্রধান বিচারপতির মত ছিল পশ্চিম বাংলার জন্য ১৯ জন জজের প্রয়োজন। ১৯৪৮ সালে জানুয়ারী মাসে আমার মন্ত্রিত্ব ত্যাগের পূর্বে এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি।

উপরি-উক্ত কাজ ছাড়া ৫ মাস মন্ত্রী থাকার সময় যা যা করি তা সংক্ষেপে এই ঃ—(১) সচিবালয়ের ফাইলে বাংলায় নোট লিখবার নির্দেশ দেওয়া হয়। তা খুব উৎসাহ সহকারে কার্যে পরিণত করে মুখ্যসচিব। ডাঃ রায় মন্ত্রিপ্রধান হয়ে তাঁর কাছে ইংরেজীতে নোট দিতে বলেন মুখ্যসচিবকে। এইখানেই এ শুভ প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি। পরে ডাঃ রায় সুকুমারকে মুখ্যসচিব পদ হতে সরান। তাতে সুকুমারের শাপে বর হয়। নির্বাচন কমিশনার হিসাবে তার খ্যাতি ভারত ও ভারতের বাইরে হয়।

(২) তৃতীয় শ্রেণীর পরিবর্তে পঞ্চম শ্রেণীর পর ইংরেজী শিখাবার নির্দেশ দেওয়া হয়। ইচ্ছা ছিল ক্রমে তা অষ্টম শ্রেণীর পর করা হবে।

(৩) সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কোন স্কুল, কলেজ বা হাসপাতাল সম্প্রদায় বিশেষের জন্য নির্দিষ্ট রাখতে পারবে না। ব্যতিক্রম টোল ও মাদ্রাসা।

(৪) মফঃস্বল কলেজসমূহকে অধিকতর সাহায্য দেওয়ার নীতি গৃহীত হয়। বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ ও শান্তিনিকেতনকে সাহায্য দেওয়া স্থির হয়। বেলুড় বিদ্যাপীঠকে অক্টোবর মাস হতেই সাহায্য দেওয়া হয়।

(৫) প্রথম আট বছরের শিক্ষা বুনিয়াদী শিক্ষা হবে ইহা নীতি হিসাবে গৃহীত হয়।

(৬) শিক্ষা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত নয় এই আমার নিশ্চিত

মত। শিক্ষার ভার ত্যাগী সুপণ্ডিত শিক্ষাবিদদের হাতেই থাকা উচিত। প্রাচীন ভারতে শিক্ষা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ছিল না। অথচ ভারত একদিন বিজ্ঞানেও জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল। সরকার টাকা দিবে এবং যে কাজের জন্য যে টাকা দিয়েছে সে কাজে তা ব্যয় হয়েছে কিনা এইটুকু দেখবে মাত্র। শিক্ষাবিদরাও এম. এল. এ., এম. পি. হবেন না। রাজাজী এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত ছিলেন। তিনি বেলুড় মঠে একদিন মিশন কর্তৃপক্ষকে শিক্ষার ভার নিতে বলেন। তাঁদের সে ক্ষমতা নেই বলে রাজী হন না। আমার ইচ্ছা ছিল এরূপ যেসব সেবামূলক প্রতিষ্ঠান তারা মিলে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন দিক দিয়ে শিক্ষার ভার নিক।

(৭) ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে যোগ্যতাই একমাত্র মাপকাঠি স্থির হয়। মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারদের ছেলেদের ও মন্ত্রীদের মনোনয়নে কয়েকটি ছাত্র ভর্তির ব্যবস্থা বাতিল করা হয়।

(৮) আণবিক পদার্থ বিজ্ঞানাগার তৈরী করার জন্য বিজ্ঞান কলেজকে ২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। সরকারী কলেজে বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য বৎসরে অতিরিক্ত ১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ন বিজ্ঞানাগার নূতন করে গঠনের পরিকল্পনা হয়।

(৯) পূর্ব বাংলা হতে আগত ছাত্রদের জন্য সরকারী কলেজ, মেডিক্যাল স্কুল ও কলেজে ডবল সিফট প্রবর্তিত হয়।

(১০) প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের মাইনে মাসিক ১০ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

(১১) রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক বাড়ী আনুষ্ঠানিকভাবে দখল করে রবীন্দ্র স্মৃতি-রক্ষা কমিটির হাতে দেওয়া হয় ৩০শে আগষ্ট। পরে বার্ষিক ৫ হাজার টাকার তিনটি রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান দেখতে যাই কাঁঠালপাড়া কিন্তু কি করা যায় সে পরিকল্পনা হয়নি মন্ত্রিত্ব থাকা পর্যন্ত।

(১২) ভগ্নস্বাস্থ্য কবি নজরুল ইসলামকে মাসিক ১০০ টাকা ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

(১৩) বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য কলকাতার বাইরে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় করার পরিকল্পনা করি। এ জন্য ঝাড়গ্রাম রাজ এষ্টেটের তরফ হতে ঐ শহরের অল্পদূরে পাকা রাস্তার ধারে ৮০০ বিঘা জমি, তার কাছেই ৫০ বিঘা একটি জলের ঝিল বিনামূল্যে ও নগদ এক লক্ষ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। কিন্তু এ বিষয়ে কোন কাজ আরম্ভ করার পূর্বেই আমাকে মন্ত্রিত্ব ছাড়তে হয়।

(১৪) ক্রমে ক্রমে মাদক-দ্রব্য বর্জন-নীতি হিসাবে গ্রহণ করে কয়েকটি জিলায় তা সুরু করা হয়। একটি জিনিস চিরদিনই আমার মনোবেদনা দেয়। জার্মান জাতীয় সঙ্গীতে মদের প্রশংসা আছে। কিন্তু একদিনে নবদ্বীপে ভগীরথ দশহরার দিনে যত মাতাল দেখেছি তার একাংশও দেখিনি ইউরোপ বা জগতের অন্য কোন স্থানে।

(১৫) নিম্নবেতনের সরকারী কর্মচারীদের মাইনে বছরে ২ কোটি টাকা বাড়িয়ে দেওয়া স্থির হয়, কেন্দ্র হতে এক কোটি টাকা পাওয়া যাবার আশায়। কেন্দ্রীয় সাহায্য না পাওয়ায় রায় মন্ত্রিসভা এক কোটি টাকা বাড়ায়।

(১৬) ১৯৪২ সালে ঝড় ও সামুদ্রিক প্লাবনে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের যারা এক টাকা পর্যন্ত চৌকিদারী ট্যাক্স দেয় তাদের বন্যা ঋণ মকুব করা হয়।

(১৭) বহু কর্মচারী পূর্ব বাংলা হতে পশ্চিম বাংলায় আসে। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৫৫ বছরের পর কাউকে চাকরীতে রাখা হবে না।

(১৮) আমরা স্থির করি কোন আই. এম. এস. অফিসারকে পশ্চিম বাংলায় সরকারী চাকরীতে রাখা হবে না। ভারত সরকার রাজী হওয়ায় তা কার্যকরী হয়।

(১৯) সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীতে বাঙ্গালী একপ্রকার ছিল না বললেই চলে। তাই এই বাহিনীতে ৮০০ বাঙ্গালী নেওয়া হয়।

(২০) ছেলেমেয়েদের সবাইকে ছোট হতে গান শেখান উচিত বিদ্যালয়ে। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। তাই প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সঙ্গীতজ্ঞ পঙ্কজ মল্লিকের মত নিয়ে একটি সঙ্গীত সংস্থাকে কিছু সাহায্য দেওয়া হয় সঙ্গীত শিক্ষক তৈরীর জন্য।

(২১) মন্ত্রিত্ব গ্রহণের অল্প পরেই লক্ষ্য করি যে, কোন কোন ধনী লোকের ধারণা এই যে, এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে। শিক্ষা ব্যাপারে সরকারই সব কিছু করবে তাই আমি লোকজনের কাছে আবেদন করি শিক্ষাবিস্তার ও চিকিৎসার জন্য সরকারের হাতে টাকা দিতে। টাকা পেতেও থাকি। শেষ চেকখানা পাই ৫০ হাজার টাকার।

(২২) আমার নিশ্চিত মত এই যে, কণ্ট্রোলের দোসর দুর্নীতি। ফসল ভাল হলে ১৯৪৮ সালে কণ্ট্রোল তুলে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল। কেন্দ্রের খাদ্যমন্ত্রী রাজেন্দ্র প্রসাদ ছিলেন এবিষয়ে সহানুভূতিসম্পন্ন। কণ্ট্রোল তুলে দেওয়া যেত, কারণ ফসল ভাল হয়েছিল। জানুয়ারীতে আমাদের মন্ত্রিসভার পতনের পর তা হল না।

(২৩) ঘোড়দৌড় বন্ধ করে ময়দানের ঐ জমিটাকে সরকারের হাতে এনে সেখানে সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতাল করার ইচ্ছা হয় রোগীদের সুবিধার জন্য। টার্ফ ক্লাবের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। কিন্তু কিছু করতে পারার পূর্বেই মন্ত্রিত্ব ছাড়তে হয়।

(২৪) কলকাতায় গরুর দুধ আসত সবই প্রায় পার্শ্ববর্তী গ্রাম অঞ্চল হতে। গ্রামে অসুস্থ লোকের জন্যও একটু দুধ পাওয়া শক্ত ছিল। তাই পরিকল্পনা করি গরুর দুধ উৎপাদন করে ন্যায্য দামে কলকাতায় সরবরাহ করা। সরকারের তরফ হতে ৪ হাজার একর মত জমি দিতে চাই এজন্য। তা হবে সরকারের

শেয়ার। এ ছাড়া সরকার কিছু নগদ শেয়ারও নিবে। অধিকাংশ শেয়ার হবে ব্যবসাদারদের। পরিচালনাও তাদের। বাঙ্গালী, গুজরাটি, মাড়োয়ারী ব্যবসাদারদের কাছে আমি ব্যক্তিগত অনুরোধ করি। কিন্তু কেউ তেমন এগোয় না।

আমি যখন দলনেতা হই তখন বিধানসভার সভ্য ছিলাম না। পূজার পূর্বেই নির্বাচনে দাঁড়াই বীরভূম হতে। হিন্দু মহাসভা প্রার্থীকে পরাজিত করে জয়ী হই। এইবার নিয়ে মোট ছয়বার নির্বাচনে দাঁড়িয়েছি—পাঁচবার বিধানসভার ও একবার লোকসভার আসনে। বিধানসভার নির্বাচনে তিনবার জিতি, একবার কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে, দুইবার কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করে। লোকসভার নির্বাচনে হারি। এই নির্বাচনে আমি পেয়েছিলাম ১ লক্ষ ৪ হাজার ভোট তবুও অনেক ভোটে হারি। অনেকে বলেন আমার বিরুদ্ধে অনেক ভুয়া ভোট হয়েছিল। নির্বাচনের ব্যাপারে কয়েকটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করে জিতবার পর আমার বিরুদ্ধে মামলা করে যে আমি টাকা দিয়ে ভোট কিনে জিতেছি। ইহা সর্বৈব মিথ্যা মামলায়ও আমি জয়ী হই। শেষবারের নির্বাচনে যার কাছে পরাজিত হই তিনি উচ্চ শিক্ষিত হয়েও জনসভায় বলেন—"আমাকে ভোট দিন, তাহ'লে পাকিস্তানীকে ভোট দিতে হবে না।" পশ্চিম বাংলায় দুইবার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরও আমি পাকিস্তানী। শেষ নির্বাচনের প্রাক্কালে অতুল্য ঘোষ এক বিবৃতি দেয় যে, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও প্রফুল্লচন্দ্র সেনের মধ্যে অধিকাংশ কংগ্রেসের লোক চায় যে প্রফুল্লচন্দ্র সেন মুখ্যমন্ত্রী হবেন। এ গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। নির্বাচনে কংগ্রেস হল সংখ্যালঘিষ্ঠ, আর আমি পরাজিত। এইবার আমি কংগ্রেসপ্রার্থী। এইবারই আমার নির্দেশের বিরুদ্ধেও সরকার-নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশী খরচ করে কংগ্রেস কর্মীরা একটা মিথ্যা রিটার্ণ তৈরী করে দেয় দাখিল করার জন্য। আমি তা দাখিলও

করি না, অতিরিক্ত টাকাও দেই না। আমি এর পূর্বে কখনো নির্বাচনে নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশী খরচ করিনি এবং মিথ্যা রিটার্ণ দেইনি। লজ্জার কথা বেশ কিছুদিন যাবৎই সকল দলেরই অধিকাংশ লোক নির্বাচন ব্যয়ের মিথ্যা রিটার্ণ দাখিল করেন বলে আমার ধারণা। এরাই দেশের ভাগ্য-বিধাতা। ফল যা হবার তা হয়েছে।

১৯৪৭ সালে নির্বাচনের সময় পরিচয় হয় বিখ্যাত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার নির্বাচনে সাহায্য করেন। ক্রমে তাঁর সঙ্গে হয় ঘনিষ্ঠতা। দুঃখের বিষয় তিনিও আজ আমাদের মধ্যে নেই।

ছায়া মন্ত্রিসভায় থাকা কালেই বুঝি আমার মন্ত্রিসভার সামনে যে সব বিপদ। বল্লভভাইয়ের ইচ্ছা সম্বন্ধে মহাত্মাজীর চিঠির কথা পূর্বেই লিখেছি। যাদের ইচ্ছায় মন্ত্রী হই তাদের মধ্যে একজন এসে একদিন বলেন যে, মন্ত্রিসভার বাইরের কয়েকজন বিশিষ্ট লোককে নিয়ে একটি কমিটি করা হোক যার সঙ্গে পরামর্শ করে সব কাজ করা হবে। আমি বলি তা অসম্ভব। আমি বলি যে, এরূপ হলে সরকারের বাইরের লোককে সরকারী গোপন তথ্য বলতে হবে এবং ঐ কমিটি সুপার কেবিনেটে পরিণত হবে। এর কোন জবাব দিতে পারেন না তিনি, কিন্তু সন্তুষ্ট হন না। তৃতীয় বিপদ আসে ছায়া মন্ত্রি সভার সভ্য রাধানাথ দাসকে নিয়ে। এস. এন. রায়, আই-সি-এস. আমাকে একটি ফাইল দেয় তাতে এই অভিযোগ ছিল যে, লীগ মন্ত্রীর যোগসাজসে রাধানাথ দাস দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছেন। এই বিষয়ে আলোচনার সময় হুগলীর কেউ কেউ এসে আমাকে বলেন—'আপনি অফিসারকে ধমক না দিয়ে কেন ফাইল নিলেন।" আমি বলি—"এসব অযৌক্তিক। কোন পদস্থ কর্মচারী যদি ফাইল দেয় তা নিতেই হবে। আর দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে তদন্তও করতে হবে। সে তদন্ত কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টও করতে পারেন আমিও করতে পারি।" তারা আমাকেই তদন্ত করতে বলেন। কিন্তু রাধানাথ

যথাযথ তদন্তে কিছু অসুবিধা সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় দিল্লীতে একদিন প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে বলি—"প্রফুল্ল, তুমি এসো মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রী রূপে। রাধানাথকে বাদ দেওয়া হোক। আমাদের মধ্যে মতভেদ হতে পারে। সাধারণ রকমের হলে নিজেরাই মিটিয়ে নেব। গুরুতর হলে তুমি ও আমি একযোগে মহাত্মাজীর কাছে যেয়ে নিজ নিজ কথা বলব। সব শুনে তিনি যে রায় দেন তা দুই ভায়েই মেনে নেব।" প্রফুল্ল এই প্রস্তাবে রাজী হয়। কিন্তু কলকাতায় এসে মত বদলায়। তার হুগলীর বন্ধুরা কেউ কেউ চাইছিল রাধানাথকে প্রতিষ্ঠিত করতে আর এস. এন. রায়কে অপদস্ত করতে। আর ধীরেন মুখার্জীর ইচ্ছা ছিল অর্থমন্ত্রী হওয়ার। এদের কোন ইচ্ছাই পূরণ হয়নি। রাধানাথ মন্ত্রিসভায় স্থান পায়নি, প্রফুল্লচন্দ্র সেন মন্ত্রী থাকা কালে এস. এন. রায় মুখ্যসচিব হন, ধীরেনও অর্থমন্ত্রী হয়নি। দুঃখের বিষয় ধীরেন আজ আমাদের মধ্যে নেই।

এরপর ডিসেম্বর মাসে একদিন ঘনশ্যামদাস বিড়লা কংগ্রেস এম. এল. এ.-দের অর্ধেকের ৩।৪ জন বেশী সভ্যের দস্তখত করা একখানা কাগজ নিয়ে এসে ৮নং থিয়েটার রোডে আমাকে দেন। তাতে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিল না; শুধু শাসনব্যবস্থা ভাল করে পরিচালনার জন্য নেতার পরিবর্তন দরকার এবং তাঁরা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে নেতা করতে চান। বিড়লা পরিবারে মদ বা মেয়ে ঘটিত অনাচার ঢুকতে পারে না এই দুই মহৎ গুণ এই ধনী পরিবারের আমার ভাল লাগে। কিন্তু এইভাবে রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা হচ্ছে—হাতে ক্ষমতা অথচ দায়িত্ব নেই। এ শুধু দেশের নয় বিড়লা পরিবারের পক্ষেও অকল্যাণকর। অবশ্য বিড়লা পরিবারে কেউ যদি যথারীতি নির্বাচিত হয়ে মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হন তাতে বলবার কিছু নেই। এইবার আমার মন্ত্রিত্বের শেষের দিকে নিরাপত্তা আইনের মেয়াদ ফুরিয়ে যায়। অস্ত্র সংগ্রহ, সাম্প্রদায়িকতা প্রসার, আবশ্যক পণ্যদ্রব্য সরবরাহের অসুবিধা সৃষ্টি প্রভৃতি কাজ বন্ধ করার

জন্য অন্ততঃ এক কি দুই বছরের জন্য এরূপ আইন থাকা প্রয়োজন মনে হয়। সুষ্ঠুভাবে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হলে এই সময়ের পর এর প্রয়োজন হবে না। দীর্ঘকাল এরূপ আইন চালু রাখা অর্থ গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করা। মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করতে হবে বুঝেও দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এই আইন পাশ করিয়ে যাই।

নিরাপত্তা আইন যখন বিধানসভায় আলোচিত হচ্ছিল তখন একদিন জীপে করে এসে একদল বিধানসভার কম্পাউণ্ডে পাথরের টুকরা ছুঁড়তে থাকে। পুলিশ তাহাদিগকে নিরস্ত করতে যেয়ে গুলি ছোঁড়ে। বিশদভাবে তদন্ত করে দেখা যায় গুলি করা ভিন্ন উপায় ছিল না। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় গুলিতে একজন নিরপরাধ শিশির মণ্ডল মারা যান। ঝুকি নিয়েও শিশির মণ্ডলের মৃতদেহ নিয়ে মিছিল করে যেতে দেই।

কংগ্রেস দলের অধিকাংশের সমর্থন আমার পেছনে নেই বুঝে ১৪ই জানুয়ারী আমি দলনেতার পদত্যাগ করি। ২১শে জানুয়ারী ডাঃ রায় নেতা নির্বাচিত হন। ২২শে জানুয়ারী আমি সচিবালয় হতে বিদায় নেই। ডাঃ রায় নেতা হয়ে আমাকে তাঁর মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে যোগ দিতে অনুরোধ করেন। আমি তাতে রাজী হইনি। আজও মনে হয় ঠিকই করেছিলাম।

১৯৪৭ সালে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে। তা হচ্ছে পাকিস্তান সমর্থিত হানাদারদের দ্বারা কাশ্মীর আক্রমণ। উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আবদুল কায়ুম খান প্রকাশ্যে এদিগকে সমর্থন করেন এবং সারা মুসলিম জগতের কাছে আবেদন করেন এদিগকে সাহায্য করতে। জিন্না সাহেবের সম্মতি ভিন্ন এ কাজ কিছুতেই সম্ভব ছিল না। কাশ্মীরের মহারাজা ভারতভুক্তির প্রস্তাব মেনে নিলে ভারত সরকার সৈন্য পাঠায় কাশ্মীরের সাহায্যে। মহাত্মাজীও তা অনুমোদন করেন। যুদ্ধ আর এক সপ্তাহ চললে সমস্ত কাশ্মীর ভারতীয় সৈন্যের দখলে আসত। কিন্তু জানি না কেন

জওহরলালজী যুদ্ধ থামিয়ে সমস্ত বিষয়টা রাষ্ট্রসঙ্ঘের হাতে দিলেন। প্রচণ্ড ভুল করলেন বলে মনে হল। আজ পর্যন্তও কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হল না। যে অংশ পাকিস্তানের দখলে ছিল তা আজও তার দখলে।

মন্ত্রিত্ব ছাড়বার পর দিল্লী যাই মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। ২৬শে জানুয়ারী তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা। ভারত সরকারের উপর অসন্তুষ্ট। বললেন—"প্রফুল্ল, এই স্বাধীনতা চেয়েছিলাম? আর ১২৫ বছর বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা নেই।" ২রা ফেব্রুয়ারী হতে ৭ দিনের জন্য কিছু লোককে ওয়ার্ধায় ডাকছেন কি করা যায় স্থির করতে। আমাকে অবশ্য যেতে হবে বললেন। আমিও যাব বললাম। কিন্তু যেতে হল না। ৩০শে জানুয়ারী দিল্লীতে বিড়লা ভবনে প্রার্থনা সভায় প্রবেশের সময় নাথুরাম গডসের গুলিতে 'রামনাম' মুখে নিয়ে হল তাঁর জীবন অবসান। মহাত্মাজী জন্মেছিলেন গুজরাটে কিন্তু মৃত্যুকালে ছিলেন সারা বিশ্বের।

এই সময় বল্লভভাই কেন্দ্রে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আমি তখনও মনে করতাম এখনও করি যে, এরূপ ঘটনা ঘটলে সেখানকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত। আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী থাকা সময় যদি পশ্চিম বাংলায় এরূপ ঘটনা ঘটত তবে আমি নিশ্চয় পদত্যাগ করতাম। পদত্যাগ না করলে তাঁকে মন্ত্রী পদ হতে বাদ দেওয়া উচিত। এই মর্মে জওহরলালজীকে চিঠি লিখি। বল্লভভাই পদত্যাগ ত করলেনই না বরং আমার উপর খুব অসন্তুষ্ট হন। কৃপালানীজী বলেন জাপানে এরূপ ঘটনা ঘটলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী 'হেরিকেরী' করতেন।

১৯৪৮ সালে যখন মন্ত্রী নই কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য তখন ওয়ার্কিং কমিটি আমাকে ময়ূরভঞ্জ ও কুচবিহার এই দুই দেশীয় রাজ্য কোন্ প্রদেশে যাবে সে বিষয়ে তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে বলে। আমি রিপোর্ট দেই ময়ূরভঞ্জ যাবে উড়িষ্যায় এবং কুচবিহার যাবে

পশ্চিম বাংলায়। বল্লভভাইয়ের মত ছিল কুচবিহার যাবে আসামে। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি আমার মতই গ্রহণ করে।

ডাঃ রায়ের প্রথম মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনেন যোগেশচন্দ্র গুপ্ত, কংগ্রেস এম. এল. এ.। জওহরলালজী আসেন তদন্ত করতে। তদন্ত করে তিনি পশ্চিম বাংলায় নির্বাচনের নির্দেশ দেন। কিন্তু তা হল না। কেন তা বলতে পারি না। এরপর একবার বল্লভভাই ডাঃ রায়ের উপর বিরূপ হন এবং আমাকে মুখ্যমন্ত্রী করতে চান। তার সঙ্গে একটি সর্ত ছিল। মহাত্মাজীর হত্যার পর বল্লভভাইয়ের পদত্যাগ করা উচিত ছিল আমার এই মন্তব্যের সংশোধন চান। তা করা সম্ভব নয় তাই আমি এগোইনি।

দুই বছর যেতে না যেতেই বুঝি বিধান রায় মন্ত্রিসভার দ্বারা বাংলার প্রকৃত কল্যাণ হবে না। অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার ত আলাপের সময় স্বীকার করেন যে, আগে লোক নিযুক্ত হয় পরে স্থির হয় তাকে কি কাজ দেওয়া হবে। আমি বলি—"আপনিই ত অর্থমন্ত্রী।" নলিনীবাবু—"আর কি আগের দিন আছে?" আমি—"তবে. মন্ত্রী থাকেন কেন?" দুঃখের সঙ্গে নলিনীবাবু বলেন —"সেই ত প্রশ্ন।"

১৯৪৯ সালে কিরণশঙ্কর রায় গুরুতর অসুস্থ। তখন একদিন তাঁকে দেখতে যাই ৮নং থিয়েটার রোডে। তিনি রাজনীতির আলোচনা আরম্ভ করেন। যত বলি আমি এসেছি আপনাকে দেখতে, রাজনীতির আলোচনা করতে নয়, তত তিনি জোরের সঙ্গে রাজনীতির কথা বলেন। বাধ্য হয়ে শুনি। তিনি বলেন—"বুদ্ধিমান লোকের মন্ত্রিসভা না ছাই। সততা না থাকলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাজও করা যায় না।" বিদায়ের সময় বলি "ভাল হয়ে উঠুন এই কামনা।" দুঃখের বিষয় আর ভাল হয়ে উঠলেন না।

মহাত্মাজীর শেষকৃত্যের সময় দিল্লী যেতে পারিনি। কিন্তু যেভাবে তা হয়েছিল মোটেই ভাল লাগেনি। সেই জিনিসেরই খুব সুন্দরভাবে রূপ দেন এক আমেরিকান মহিলা ১৯৫৩ সালে

বোষ্টনে—"আপনারা অহিংসার কথা বলেন কিন্তু আপনারা সামরিক কায়দায় অহিংসার শ্রেষ্ঠ পূজারীর শেষকৃত্য করলেন।" ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে তিক্ততা বাড়ছে দেখে একবার ওয়ার্কিং কমিটির অনুমতি নিয়ে ঢাকায় যাই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎআলী-খানের সঙ্গে দেখা করতে। আমি ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য। লিয়াকৎ সাহেবের কাছে পাই প্রীতি ও হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার। খুব খোলা-খুলি আলাপ হয়। তার সারমর্ম জওহরলালজী ও লিয়াকৎ সাহেবকে পাঠাই। আলাপের সময় আমি বলি—"আপনার বক্তৃতার সব কথাই আমার ভাল লাগে তবে একটি বিষয়ে আমার খটকা লাগে।" তিনি বলেন "সেটি কি?" আমি বলি—"প্রতি সভায় আপনার প্রতিরক্ষার কথা বলা। আপনি যখন প্রতিরক্ষার কথা বলেন তখন হিন্দুরা ঘাবড়ে যায়, তেমনি আমরা যখন প্রতিরক্ষার কথা বলি তখন মুসলমানরা ঘাবড়ে যায়। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার অর্থ ভারতের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা; ঠিক তেমনি ভারতের প্রতিরক্ষার অর্থ পাকিস্তানের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা। আমরা কেউ আমেরিকা, রাশিয়া বা বৃটেনের সঙ্গে লড়াই করতে পারি না।" তিনি বলেন—"তা ঠিকই।" আমি আরো বলি—"এমন কি অস্ত্র ইত্যাদি তারা না দিলে আমরা লড়াইও করতে পারি না।" এবারও তিনি হাঁ বলেন। তখন আমি বলি—"এ কি প্রীতিকর অবস্থা?" উত্তরে তিনি বলেন—"নিশ্চয়ই না। আপনারা ইংলণ্ড আমেরিকার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে চান, আমি আপনাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছি।" তিনি অবশ্য এ কথা স্বীকার করেন যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্প্রীতি দরকার দুই দেশেরই স্বার্থে নতুবা দুই দেশেরই অকল্যাণ। দুই দেশের মধ্যে সম্প্রীতি ত হয়ইনি, হয়েছে চারবার লড়াই। প্রতিবারেই পাকিস্তান পরাজিত। তবু কারো কারো মুখে লড়াইয়ের হুমকি। জিতেও ভারতের অবস্থা শোচনীয়। ভুখা মানুষ সর্বত্র। ভগবান মানুষকে শুভবুদ্ধি দিন যেন তারা

মানবপ্রেমী হয়ে ওঠে। এই ভারত-আত্মার শাশ্বত বাণী। দুঃখের বিষয় ১৯৫১ সালে লিয়াকৎ আলী খান সাহেব আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারান লাহোরে।

১৯৫০ সালে পূর্ববাংলায় ঢাকা, বরিশাল, চাটগাঁ প্রভৃতি জিলার কোন কোন জায়গায় হিন্দুদের উপর ভীষণ অত্যাচার হয়। ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ করে এবং সব শুনে মন বেদনায় ভরে ওঠে। ঢাকা শহরে ছিলাম মন্ত্রী হবিবুল্লা বাহারের বাড়ীতে। আপনজনের মত ব্যবহার পাই সমস্ত পরিবারের কাছে। প্রায় সব জায়গায়ই অল্পকিছু লোক শান্তি ফিরিয়ে আনার কাজে এগিয়ে আসেন। পূর্ব বাংলা হতে দলে দলে হিন্দুরা পশ্চিম বাংলায় আসতে থাকে। এরপর পশ্চিম বাংলায়ও মুসলমানদের উপর অত্যাচার আরম্ভ হয়। সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করি। এ কাজে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী। দুই দেশের মধ্যে লড়াই লাগবার অবস্থা হয়। শেষ পর্যন্ত হয় নেহেরু-লিয়াকৎ আলী চুক্তি। রায় মন্ত্রিসভা এ চুক্তি লোককে বুঝিয়ে কার্যকর করার ব্যাপারে তেমন উৎসাহ দেখায় নি। শঙ্কর রাও দেও ও আমি দুই বাংলার বিভিন্ন স্থানে চুক্তির সারমর্ম বুঝাবার জন্য সফর করি। নেহেরু-লিয়াকৎ আলী চুক্তি অনুযায়ী দুই দেশেরই সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্য মন্ত্রী নিয়োগের প্রস্তাব হয়। আমাকে কেন্দ্রে সংখ্যালঘু মন্ত্রী করতে চান জওহরলালজী। ডাঃ বিধান রায়ের প্রবল আপত্তিতে তিনি সে ইচ্ছা ত্যাগ করেন। তখন তিনি আমাকে ঢাকায় এডিশন্যাল হাই কমিশনার হিসাবে যেতে অনুরোধ করেন। বন্ধুদের কারো কারো আপত্তি সত্ত্বেও আমি রাজী হই। ভারত-পাক মৈত্রী প্রতিষ্ঠায় যদি কিছু করতে পারি এই আশায়। পাকিস্তান সরকার এডিশন্যাল হাই কমিশনার পদ সৃষ্টিতে আপত্তি করে যদিও আমার সম্বন্ধে কোন আপত্তি ছিল না। তাই যাওয়া হল না।

এদিকে কংগ্রেসের ভিতরে আভ্যন্তরীণ দলাদলি বাড়তে থাকে।

জয়পুর কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের ভিতর দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। গান্ধীপন্থী নেতা ডাঃ পট্টভিকে পরাজিত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন বল্লভভাই। বিরক্ত হয়ে পশ্চিম বাংলার কুমার জানা, দাশরথি তা ও অধ্যাপক সত্যেন চট্টোপাধ্যায় কংগ্রেস ত্যাগ করেন। এরপর নাসিক কংগ্রেস। সেখানেও কোন আশার আলোক দেখলাম না। ১৯৫০ সালে ডিসেম্বরে প্রায় আড়াইশ সহকর্মী কলকাতায় একত্র হয়ে কংগ্রেস ত্যাগ করা স্থির করি। গঠিত হয় কৃষক মজদুর পার্টি। সভাপতি সুরেশদা, সম্পাদক আমি। কংগ্রেস হতে পদত্যাগ পত্র পাঠাই সভাপতি পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডনের কাছে। তিনি তা প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করে বলেন—"আসুন, একযোগে কাজ করে দুর্নীতি দূর করি।" তা সম্ভব নয় জানাই। যদিও ট্যাণ্ডনজীকে সৎলোক বলেই মনে করতাম। এরপরও তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বরাবর মধুর ছিল। তিনি কলকাতায় এলে আসতেন আমার কাছে আমিও যেতাম তাঁর কাছে। এলাহাবাদ গেলেও দেখা হত। তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে এলাহাবাদে তাঁর বাসস্থানে।

জওহরলালজী আমার কংগ্রেস ত্যাগের খবর পেয়ে দুঃখিত হয়ে চিঠি দেন। কংগ্রেসের ভিতর যোগ্য স্থান অধিকার করে থাকতে বলেন এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করেন। তাঁর সুবিধামত দিনে দেখা করতে যাই। দিল্লী স্টেশনে নেমে দেখি শঙ্কর রাও উপস্থিত। কৃপালানীজীর বাসায় উঠি। এঁরা দুজনেই তখন কংগ্রেসে। এঁদের অকৃত্রিম প্রীতি ও ভালবাসা আমার জীবনের গর্বের বস্তু। শঙ্কর রাও কংগ্রেসে আমি অন্য পার্টিতে এমন অবস্থায়ও কলকাতায় রাষ্ট্রীয় সমিতির সভা উপলক্ষে এসে আমার বাসায় ওঠেন। দুঃখের বিষয় শঙ্কর রাও আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৭৪-এ পৃথিবী হতে বিদায় নিয়েছেন। হারালাম একজন অকৃত্রিম বন্ধু। শেষ দেখা তাঁর সঙ্গে ১৯৭২ সালে কলকতায়।

একদিনের জন্য এসেছিলেন। আমার কাছে এসে প্রায় ঘণ্টাখানেক প্রীতিপূর্ণ আলাপ করেন। পাই পরম আনন্দ।

দুপুরে খাওয়ার টেবিলে জওহরলালজীর সঙ্গে আলাপ। তখন তাঁকে কংগ্রেসের উচ্চস্তরে দুর্নীতির কথা বলি। তিনি তা অস্বীকার করেন না। কিন্তু তা দূর করতে গেলে সমস্যার সমাধান না হয়ে আরো জটিল হবে বলেন। তখন আমি বলি—"তা হলে কংগ্রেসে ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন কি করে ওঠে। এইখানেই আলোচনা শেষ।

এবার পার্টি গঠন হল বিশেষ কাজ। জিলায় জিলায় ঘুরে সভা-সমিতি ইত্যাদি করে পার্টির সংগঠনে সাহায্য করি। সহকর্মীদের স্পষ্ট বলি যে, কংগ্রেস জনগণের কল্যাণ করতে পারবে না, কিন্তু তার একটা পৈতৃক সম্পত্তি আছে যা খোয়াতে কিছু সময় লাগবে। আমাদের দলের কোন সম্পত্তি নেই। অধিকতর ত্যাগ ও আদর্শ নিষ্ঠা দ্বারা তা সৃষ্টি করতে হবে। নতুবা কংগ্রেসের পূর্বেই এই দলের ধ্বংস অনিবার্য। দেশে আজ ত্যাগ-ভাবনার অভাব সকল দলেই অল্পাধিক। তাই দেশের আজ দুরবস্থা।

১৯৫০ সালে আমার জীবনের আরো দুইটি বিশেষ ঘটনা ঘটে :—(১) প্রখ্যাত নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বৃটিশ রসায়ন বিজ্ঞানী স্যার রবার্ট রবিনসনের কলকাতায় অভ্যর্থনা সভার সভাপতিত্ব, (২) কল্যাণীয়া মা সাধনা বিশ্বাসের (পরে সোম) সঙ্গে প্রথম পরিচয়। স্যার রবার্টের অভ্যর্থনা সভা অল্পলোকের। কিন্তু একত্রে এত গুণী লোকের সমাবেশ আমার জীবনে দেখিনি। তাঁর সঙ্গে আলাপের সুযোগ ত হয়ই, আর হয় বিখ্যাত ম্যাডাম কুরীর মেয়ে আইরিণ কুরী জলিওর সঙ্গে। তিনিও স্বামী ফ্রেডারিক জলিওর সঙ্গে একযোগে নোবেল পুরস্কার পান। রবিনসনের গবেষণা সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা শুনে শ্রীমতী জলিও একজনকে জিজ্ঞাসা করেন আমি কে। সেই সূত্র ধরে তাঁর সঙ্গে আলাপ। অবশ্য শ্রীমতী জলিওর মা মেরী কুরীই একমাত্র বিজ্ঞানী

যিনি দুইবার বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। প্রথমবার স্বামী পিয়ারী কুরীর সঙ্গে পদার্থ বিদ্যায়। দ্বিতীয়বার স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে রসায়ন বিজ্ঞানে। অথচ এই মেরী কুরীকে (অবিবাহিতা নাম মেরী স্ক্লোডোভস্কা) তাঁর জন্মদেশ পোলাণ্ডের ক্র্যাকাউ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের ক্লাসে ভর্তি করেনি। অধ্যাপক তাঁকে দেখেই বলেন—"তুমি এসেছ কেন? মেয়েদের জন্য একমাত্র বিজ্ঞান রান্না করা।" রবিনসনও চলে গেলেন ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ সালে ৮৮ বছর বয়সে। দুঃখ হল খবরটা পড়ে।

সাধনার সঙ্গে পরিচয়ের পর ক্রমে বুঝি যে বেশ গুণী মেয়ে ও তার বহুমুখী প্রতিভা। স্বাধীনোত্তর ভারতে যত মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি তাদের মধ্যে তাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। সে সুলেখিকা, সুবক্তা ও সুগায়িকা। শিল্পী মন তার। ফটো উঠাতে দক্ষ। ছবি আঁকতে পারে। সংগঠন ও প্রশাসনিক ক্ষমতাও বেশ। সর্বোপরি তার সরলতা ও ভগবদ্ বিশ্বাস আমার খুব ভাল লাগে। তার বাবা চাটগাঁর হরিপ্রসন্ন বিশ্বাসের অনুমতি নিয়ে ১৯৫২ সালে সাধনাকে দত্তক কন্যারূপে গ্রহণ করি। হরিবাবু ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত। ধন্যবাদ তাঁকে। দুঃখের বিষয় তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই। বাংলা ও ইংরেজী বাদে সাধনা হিন্দী ও জার্মান জানে। ১৯৫২-৫৩ সালে সাধনা লণ্ডনে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা ত পায়ই তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষক টি. আর. হলাণ্ডের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পায়। তাঁর মুখে সে প্রংশসা শুনে আমি নিজেকেও গৌরবান্বিত বোধ করি। ভগবান সাধনাকে দিয়ে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আরো বড় কাজ করিয়ে নিন, এই প্রার্থনা।

আমাদের কংগ্রেস ত্যাগের কিছুদিন পর ১৯৫১ সালে সারা ভারতের বিভিন্ন প্রকারের কিছু বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী দিল্লীতে কৃপালানীজীর বাসায় একত্র হয়ে কংগ্রেস ত্যাগের সিদ্ধান্ত করেন। পার্টির নাম হয় কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টি। পশ্চিম বাংলার কৃষক-

মজদুর পার্টি এর অন্তর্ভুক্ত হয়। পার্টির প্রথম সম্মেলন হয় পাটনায়। বেশ উৎসাহ। কিন্তু এই দল বা অন্য দলের দ্বারাও দেশের আশানুরূপ ফল লাভ হয়নি। সংবিধানের ত্রুটি আছে। কিন্তু আসল গলদ অন্যত্র। আমাদের সংবিধান অনুযায়ী কোন দল সংখ্যালঘিষ্ঠের ভোট পেয়েও সরকার গঠন করতে পারে। যেমন হয়েছিল পশ্চিম বাংলায়। শতকরা ৩৮ জনের ভোট পেয়েও কংগ্রেস বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সরকার গঠন করে। এই হিসাবে ইজরায়েলের সংবিধান ভাল। যে দল যত সংখ্যক ভোট পায় সেই অনুপাতে আসন পায়। সংখ্যালঘিষ্ঠের ভোট পেয়ে সরকার গঠন করতে পারে না। সংবিধান এরূপ হলেই যে সব হয়ে যাবে তা নয়। এই প্রসঙ্গে মহাত্মাজীর একটি উক্তি মনে পড়ে:—"সংবিধান মূর্খের হাত হতে রক্ষা পেতে পারে, কিন্তু দুষ্ট লোকের হাত হতে নয়। বিঠলভাইয়ের হাতে সংবিধান দিলে সে ৭ দিনের মধ্যেই ভেঙ্গে চুরমার করতে পারে।" আসল কথা সততা ও সবার জন্য প্রেম। তার অভাবেই আজ এই দুরবস্থা। আর পৃথিবীর কোন দেশ আমাদের শত্রু নয়—না রাশিয়া, না আমেরিকা, না সৌদী আরব, না ইজরায়েল। প্রত্যেক দেশেরই গুণও আছে দোষও আছে। গুণের যেন অনুসরণ করি দোষের নয়। তবেই ভারত জগতে পুনরায় গরিমাময় স্থান অধিকার করবে। সর্বান্তঃকরণে তা চাই।

১৯৫২ সালে সাধনা লণ্ডনে পড়তে যায়। ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রী যারা পাশ্চাত্যে যায় তাদের সবারই ভারত সম্বন্ধে পুঁথিগত জ্ঞান ছাড়াও দেশের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকলে ভাল হয়। সাধনার পুঁথিগত জ্ঞান ছিল বেশ খানিকটা। দেখা ছিল বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর, পণ্ডিচেরীর অরবিন্দ আশ্রম, ওয়ার্ধা, সেবাগ্রাম, কাশী ও সারনাথ। যাওয়া ঠিক হলে দেখে যায় রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন, অজন্তা, ইলোরা, পুণার পার্বতী মন্দির প্রভৃতি। এই উপলক্ষে আমারও দেখা হয় অজন্তা, ইলোরা।

১৯৫২ সালে আমি প্রথম যাই পণ্ডিচেরী অরবিন্দ আশ্রমে। আশ্রমের শ্রীমা মীরাফিশারের সঙ্গে দুইবার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়। নলিনী গুপ্ত, সাহানা দেবী ও আরো অনেকের সঙ্গে আলাপের সুযোগ হয়। আশ্রমে সবাই কিছু-না-কিছু কাজ করে তা ভাল লাগে। কিন্তু অলৌকিক শক্তির উপর বিশ্বাস এখানে বেশী। আর শ্রীঅরবিন্দের যোগ একটা নূতন কিছু এ ধারণা প্রায় সবার। আমার মতে তা পতঞ্জলীর যোগের বাইরে কিছু নয়। পরে জানি মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজও এরূপ লিখেছেন। আশ্রমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মাধ্যম ফরাসী ও ইংরেজী। ইহা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত সবারই জন্য। আশ্রমে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ভাল। শ্রীঅরবিন্দের সমাধি সুরক্ষিত। আশ্রমে নানারকম ভাল ফুল চাষ দেখে মুগ্ধ হই। শ্রীঅরবিন্দ যে ঘরে থাকতেন সেখানে তাঁর একটি বড় করা ফটো সাধনার দাদা সঞ্জীবনের তৈরী। সঞ্জীবন ভাল শিল্পী। সাধনার দিদি বিভাও আশ্রমকর্মীও বেশ গুণসম্পন্না।

১৯৫২ সালে নির্বাচনে আমার ন্যায় সুরেশদাও পরাজিত। আমাদের পার্টির মাত্র ১৬ জন নির্বাচিত হন। তাঁদের নেতা হন চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী। তিনি যোগ্যতা সহকারে নিজ কর্তব্য পালন করেন। পরবর্তীকালে চারুবাবু বিধানসভা ছেড়ে দিয়ে ভূদান আন্দোলনে সারা সময় দেন। কিন্তু আমার মনে হয় তিনি রাজনীতিতে থাকলেই ভাল হত। তাঁর প্রতিভা ছিল সেইদিকে।

এই নির্বাচনে আমাদের দল দুইটি ভুল করেছিল:—(১) বহু সংখ্যক প্রার্থী দাঁড় করান, (২) বন্ধুবর প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী ডাঃ মেঘনাদ সাহার বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করান। আমার মতের বিরুদ্ধে তা হয়েছিল। ভুলের মাশুল দিতে হয়েছে। নিজ নির্বাচন ক্ষেত্রে খুব কম সময়ই দিতে পেরেছিলাম। হই পরাজিত। ডাঃ সাহার মত লোকের কি কংগ্রেস কি আমাদের পার্টি কারো প্রতিদ্বন্দ্বিতা

করা উচিত ছিল না। ডাঃ সাহা অবশ্য জয়ী হয়ে লোকসভায় যান।

১৯৫২ সালের নির্বাচনে প্রফুল্লচন্দ্র সেনও পরাজিত হয়। তাকে বিধান পরিষদের সভ্য করে মন্ত্রী করেন ডাঃ রায়। ১৯৪৮ সালে ডাঃ রায় মুখ্যমন্ত্রী হন প্রফুল্লচন্দ্র সেনের জন্য, এবার প্রফুল্লচন্দ্র সেন মন্ত্রী হন ডাঃ রায়ের জন্য।

এই নির্বাচনের পর জয়প্রকাশ নারায়ণ কলকাতায় আসেন। তাঁদের সমাজতন্ত্রী দলের একজন প্রার্থীও জয়ী হননি পশ্চিম বাংলায়। তাঁর সঙ্গে আলাপের ফলে কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টি ও সমাজতন্ত্রী দলের মিলন ঘটান স্থির হয়। দুই দলের সর্বভারতীয় কমিটি তা অনুমোদন করে এবং মিলন হয়। দলের নাম হয় 'প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল'। পরবর্তীকালে মনে হয় মিলন ঘটিয়ে ভুলই করেছিলাম। আজও সে ধারণা।

১৯৫৩ সালে ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি রওনা হই ইউরোপ-আমেরিকা ভ্রমণে। সেখানকার শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং বিজ্ঞানের প্রয়োগ করে কিভাবে দেশের উন্নতি করছে তা দেখা এবং দেশে ফিরে যতটা সম্ভব কাজে লাগান ছিল উদ্দেশ্য। ইউরোপে যাই বৃটেন, হলাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ড। ভিসা পাইনি বলে রুশিয়া যেতে পারিনি। আর যাই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। পাশ্চাত্যে সর্বত্র ভাল ব্যবহার পেয়েছি। এই ভ্রমণের ফলে বুঝে এলাম মানব প্রকৃতি বস্তুতঃ এক এবং ভাল। আর বুঝলাম প্রত্যেক দেশকেই তার নিজস্ব ধারায় গড়ে উঠতে হবে। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করে ভারতের উন্নতি অসম্ভব। এও বুঝলাম যে, আজও ভারতের দান করবার আছে। সাধনা বৃটেন ও হলাণ্ড দেখেছিল ছাত্রী হিসাবে। বৃটেনে সে আমার সঙ্গে গিয়েছিল শুধু সেক্সপীয়রের জন্মস্থানে এবং হলাণ্ডেও দুই একটি জায়গায়। ইউরোপের বাকী সব কয়টি দেশে আমার সঙ্গে

ছিল পুরোপুরি। আমেরিকা যেতে পারেনি। ফিরে সাধনার সহযোগিতায় West to-day নামক বই লিখি ইংরেজীতে তা ছাপা হয় ১৯৫৪ সালে। সাধনা তার বাংলা অনুবাদ করে। আজকের পশ্চিম নামে তা ছাপা হয়।

বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়। আলবার্ট আইনষ্টাইন, রবার্ট ওপেনহাইমার, অটোহান, ভেরনার হাইসেনবার্গ, ম্যাক্সফন লাউয়ে, ডঃ কেণ্ডাল, হাইনরিস-ভিলাণ্ড, ডঃ সুমনার, রবার্ট বি এডওয়ার্ড প্রভৃতি জগদ্-বিখ্যাত বিজ্ঞানী এবং ডাক্তার কিলপ্যাট্রিক, ডাক্তার কিং প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্দের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছে। এঁদের সবার কাছেই পেয়েছি খুব হৃদ্যতাপুর্ণ ব্যবহার। আইনষ্টাইন একজন মানবপ্রেমী ঋষিতুল্য ব্যক্তি। য়্যাটম বোমা শান্তি আনতে পারবে তা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু আজ পৃথিবী আণবিক শক্তি নিয়ে পাগল প্রায়। এতে জগতের অকল্যাণ। পরমাণুবিভাজনকারী বিজ্ঞানী অটোহান খুব হাসিখুসি দিলখোলা লোক। আর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জীবিত সংশ্লেষক জৈব রসায়ন বিজ্ঞানী মনে হল ওডওয়ার্ডকে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে আইনষ্টাইন ও ফার্মির ন্যায় সম্মান দেখিয়ে ভাল কাজ করেছে। পাশ্চাত্যে শিক্ষা সর্বব্যাপক। শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়ম-শৃঙ্খলাও আছে। স্বাধীনতার ২৮ বছর পরেও ভারতে আজ শিক্ষা সর্বব্যাপক নয়। আর শিক্ষাক্ষেত্রে একটা অরাজকতা।

পাশ্চাত্যে সর্বত্র গরুর দুধ আমাদের দেশের চেয়ে সস্তা। ফিনল্যাণ্ড সব চেয়ে বেশী দুধ খায়। সমস্ত দেশের ৪২ লক্ষ লোকের জন্য তখন ৪২ লক্ষ লিটার গরুর দুধ দৈনিক সরবরাহ করা হয়, অর্থাৎ মাথাপিছু দৈনিক গড়ে ১ লিটার। আমাদের দেশে বিরাট দুগ্ধ পরিকল্পনায় প্রচুর অর্থ ব্যয়। খাঁটি গরুর দুধ একপ্রকার দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য।

এই সফর ছিল প্রায় ৮ মাসের। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে জিতলে কিছুতেই এই সফর সম্ভবপর হত না। গিয়েছিলাম জাহাজে টুরিষ্ট

ক্লাসে। আমেরিকা যাওয়ার সময় একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। এক ওলন্দাজ পরিবারের বছর সাতেকের ছেলে আমার খুব প্রিয় হয়। আমি তার ভাষা বুঝতাম না, সেও আমার ভাষা বুঝত না। মা তাকে ভাল খাবার দিলে আমার জন্য তার খানিকটা নিয়ে এসে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যেত যেন আমি তাকে ফিরিয়ে দিতে না পারি। তার মা ও বাবা আমার সঙ্গে তার ফটো তুলে দিয়েছিল।

ইউরোপ হতে ফিরে এসে সাধনা মনে করে মহাত্মাজী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা শ্রেষ্ঠ। গ্রামাঞ্চলে তা প্রবর্তিত করতে পারলে ভাল হয়। এ কাজে আমারও বিশেষ আগ্রহ। ১৯৫৪ সালে জমির খোঁজ করতে বলি বন্ধুদের। শেষ পর্যন্ত কুমারবাবুর খোঁজ দেওয়া সুতাহাটা থানায় বাড়বাসুদেবপুর গ্রামে জমি নেওয়া ঠিক হয়। 'লোকসেবা পরিষদ' নামে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান করে কাজ করা স্থির হয়। উদ্দেশ্য সর্বাঙ্গীণ গ্রামোন্নয়ন, শিক্ষা তার একটি প্রধান অঙ্গ। পাঁচ জন অছি নিয়ে প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। অছি হলেন :—প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (সভাপতি), সাধনা বিশ্বাস (পরে সোম) সম্পাদিকা, কুমারচন্দ্র জানা, চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী ও দিগম্বর প্রধান। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম হয় 'লোকভারতী'। প্রথম হতেই সাধনা তার অধ্যক্ষ। তার ইচ্ছায় আমিও পড়াতাম। সাধনার সংগঠন শক্তিই 'লোকভারতী' গড়ে তুলেছিল। বুনিয়াদী ও উচ্চ বুনিয়াদী স্তর পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল লোকে বুনিয়াদী শিক্ষা চায় না। চায় বাবু তৈরী করা শিক্ষা। বাবু হওয়ার প্রবণতা কৃষকদের ছেলেদের মধ্যে খুব। অভিভাবকরাও বাড়ীর কম বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েকে পাঠায় এখানে। বুদ্ধিমানদের পাঠায় সাধারণ স্কুলে। এমনকি এখানকার পাশ করা ছেলেকে গরু পালন কাজে তদারকে একই মাইনে দিলেও সে চায় চেয়ার-টেবিলে বসা কলম-পেশা চাকরী। যদিও সাধনা এবং আমি নিজেও শারীরিক শ্রমের কাজ করতাম। লোকসেবা পরিষদের কাজের জন্য অধিকাংশ

টাকা পাই গান্ধী স্মারক নিধি হতে। আমিও প্রায় সোয়া লক্ষ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করি। জয়প্রকাশ নারায়ণ দশ হাজার টাকা তুলে দিবেন বলে মাত্র দুই হাজার টাকা সংগ্রহ করে দেন। কুমারবাবু সুতাহাটা থানা হতে দশ হাজার টাকা সংগ্রহ করে দেবেন বলেন। কিন্তু আমার সাহায্য নিয়েও দুই হাজার টাকাও সংগ্রহ করতে পারেননি।

কয়েক বৎসর ছাত্রদের দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। নিজেদের বাগানে তরিতরকারী, ফল, পুকুরের মাছ এবং গো-পালন করে দুধ। এক কাঠা জমিতে বৎসরে সর্বাধিক দশ মণ পর্যন্ত শাকসজী উৎপন্ন করা হয়েছে। ওলকফি, বাঁধাকফি, ফুলকফি, বীট, গাজর, টমাটো, পালং, ডাঁটা, ঢুলাশাক, লাউ, কুমড়া, চালকুমড়া, মূলা, ঝিঙে, ঢেঁড়স, পুঁই, সিম, বরবটি, শশা, ভুঁইশশা, উচ্ছে প্রভৃতি শাকসজী করা হত। সব সময়ই, বাগানে অন্ততঃ পাঁচ রকম তরকারী থাকত। দুপুরে যে তরকারী খাওয়া হত, রাতে তা খাওয়া হত না। আম, পেঁপে, কলা, পেয়ারা, সফেদা, নারিকেল প্রভৃতি ফল হত। খাওয়ার পর উদ্বৃত্ত হলে বিক্রী হত। লেবু, কামরাঙ্গা, রোয়াইল, করমচা, আমলকী, জলপাইও হত। আমের মধ্যে ছিল বোম্বাই, হিমসাগর, তোতাপুরী, মুর্শিদাবাদের আম, মীরাটের চষা আম, ল্যাংড়া, ফজলী, দশেরী, স্থানীয় ভাল আম প্রভৃতি। ঢাকার রাম পালের অমৃতসাগর কলা হয়েছিল অতি উত্তম। এজন্য সামান্য কিছু ইউরিয়া ছাড়া রাসায়নিক সার ব্যবহার করিনি। সার ছিল ধঞ্চে পাতা, পচা গোবর, খৈল, কাঠের ছাই, হাড়ের গুঁড়া বা সুপার ফসফেট। মাছ'কেও খেতে দেওয়া হত। এই অভিজ্ঞতা হয় যে, সুতাহাটা থানা খাদ্যে সবদিক দিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উদ্বৃত্ত বিক্রী করে সমৃদ্ধশালী হতে পারে। সাধনার খুব উৎসাহ এ কাজে। সাধনা নানারূপ ফুলে সুসজ্জিত করে লোকভারতী। কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, বকুল, শ্বেতকাঞ্চন, রক্তকাঞ্চন, গোলাপ, লতাগোলাপ, কামিনী, রজনী,

শিউলী, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, যুঁই, হাসনাহেনা, শ্বেতকরবী, রক্তকরবী, কল্কেফুল, নানারূপ মৌসুমী ফুল, ডালিয়া, গাঁধা বিভিন্ন রংয়ের নানারূপ লিলি, জবা, ঝুমকা জবা, নলক জবা, হলদে জবা, গুলঞ্চ প্রভৃতি।

কিন্তু প্রথম হতেই লক্ষ্য করি একদল লোকের অপরাধ-প্রবণতা আর কমিউনিষ্ট নামধারী কিছু লোকের জমি দখলের বিশেষ চেষ্টা। তাদের সঙ্গে জুটে যায় একদল সমাজ-বিরোধী লোক। তারা চুরি হতে আরম্ভ করে সব রকম কাজই করত। টাকা এসেছে খবর পেয়ে আধা ডাকাতির মত চুরির চেষ্টা করে। আদালতে একজনের জেলও হয়। বিষ খাইয়ে ষাঁড় মারে। আমাদের এখানে ত এরূপ। কুমারবাবুর আশ্রমে ক্ষেত থেকে আলু তুলে নিত। নারিকেল চুরি হত। সব চেয়ে দুঃখজনক ঘটনা ঘটে দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট সরকারের সময়। গান্ধীনিধি হতে ২৫০ টাকা এসেছে। সেই রাতেই কুমারবাবুর গলাটিপে সেই টাকা নিয়ে যায়। সূতাহাটা থানার এটা চিরকলঙ্ক। লোকসেবা পরিষদ ও লোকভারতীর কাজ করতে যেয়ে কুমারবাবুর সঙ্গে আমার ও সাধনার কোন মতভেদ হয়নি। তিনি বরাবর এই প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য যথাসম্ভব করেছেন। লোকজনের ব্যবহারে তিনি খুব ব্যথিত ছিলেন। জমি নেওয়ার পূর্বে প্রকাশ্য জনসভায় গ্রামের লোকের মত নিয়েই ৬২ একর জমি খরিদ করা হয়। তারপরও এই অবস্থা। সব চেয়ে দুঃখ বেশী হয়েছে সাধনার। এই তার সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে প্রথম কাজ। খুব ব্যথিত হৃদয় স্বাভাবিক। সারা ভারতের কোথাও বুনিয়াদী শিক্ষা চলেনি। কিন্তু এখানকার অপরাধপ্রবণতা ব্যথিত করে আমাকে। কমিউনিষ্টদের এই সব আচরণ দেখে একদিন এক কমিউনিষ্ট নেতাকে বলেছিলাম "কার্ল মার্কস মানবদরদী ছিলেন। ব্যথিত হৃদয়ে লিখেছিলেন—'ধর্ম জনগণের আফিং স্বরূপ।' তিনি আজ বেঁচে থাকলে কমিউনিষ্টদের আচরণ দেখে লিখতেন—'কমিউনিজম

জনগণের কাছে একোনিটিন স্বরূপ।' একোনিটিন অতিশয় বিষাক্ত—১/২০ গ্রেণ খেলেই মৃত্যু হয়।" একেই বলে আদর্শের বিপত্তি। শুধু কমিউনিজমের বেলায় নয়, সকল আদর্শের বেলায়ই অল্পাধিক খাটে।

১৯৫৫ সালে রাজনীতিক্ষেত্রে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, পশ্চিম বাংলা ও বিহারের সংযুক্তি নিশ্চিত। পশ্চিম বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার রায়ও এর পক্ষে। বন্ধুবর অতুলচন্দ্র গুপ্ত এর বিরোধিতা করতে এগিয়ে আসেন। আমিও বিবৃতি দিই এর বিরুদ্ধে। এরপর পশ্চিম বাংলায় দুইটি উপনির্বাচন হয়। তাতে সংযুক্তি প্রস্তাবই হয় প্রধান বিষয়। দুই জায়গায়ই কংগ্রেস পরাজিত। সামনে সাধারণ নির্বাচন। কংগ্রেসের ভরাডুবি হবে ভেবে সংযুক্তি প্রস্তাব পরিত্যক্ত হল। পন্থজী ও ডাক্তার রায় যেমন ছিলেন তেমনই রয়ে গেলেন। ১৯৫৬ সালে কুমারবাবু বিধান সভার সদস্যপদ ছেড়ে দিয়ে সারা সময়ের জন্য ভূদান আন্দোলনে যোগ দেন। ঐ আসনে আমাকে দাঁড়াতে অনুরোধ করেন কেউ কেউ। একবার পরাজিত হলে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে আর না দাঁড়ান ছিল আমার সিদ্ধান্ত। হৃষীকেশ ত্রিপাঠী দাঁড়ান প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের পক্ষে। এবারও কংগ্রেস পরাজিত। দুইবার পরাজিত হয়ে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা সুতাহাটা মহিষাদলকে একটি সাধারণ ও একটি তপশিলী আসন বিশিষ্ট যুক্তকেন্দ্রে পরিণত করে। ১৯৫৭ সালে এই যুক্তকেন্দ্র হতে আমি নির্বাচিত হওয়ার পর সুতাহাটাকে পুনরায় পৃথক কেন্দ্রে পরিণত করা হয় এবং তা তপশিলী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অথচ মহিষাদলে তপশিলীর সংখ্যা সুতাহাটার চেয়ে বেশী। এই হল তখনকার কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ও কংগ্রেসের স্বরূপ।

আমাদের সংবিধানে ১০ বছরের জন্য তপশিলী সম্প্রদায়ের জন্য

আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। তারপর ২৫ বছর চলে গিয়েছে। দেশ সে কথা ভুলে গেল। তাতে হরিজনদেরও অকল্যাণ। ভারতবর্ষে পার্শীরা একটি ছোট সম্প্রদায়। মোট প্রায় ২½ লক্ষ লোক। এরা কোনদিন বিশেষ সুবিধা চায়নি। অথচ এদের মধ্যে দেখতে পাই দাদাভাই নৌরজী ও ফিরোজশা মেহতার ন্যায় রাজনীতিবিদ্। টাটা ও ওয়াদিয়ার ন্যায় ব্যবসায়ী ও দানবীর, ওয়াদিয়া ও ভাবার ন্যায় বিজ্ঞানী, মানেকশার ন্যায় সেনাপতি। আমার দুঃখ আমাদের দলের তপশিলী প্রার্থী শ্রীহৃদয়নাথ দাস জয়ী হতে পারেননি। পরাজিত হলেও নির্বাচন কমিটির হাতে প্রতিশ্রুত সব টাকা দেন। তিনি সৎ ও যোগ্য লোক ছিলেন। সবচেয়ে দুঃখের এই যে, তিনি অনেকদিন আমাদের মধ্যে নেই।

১৯৫৭ সালের পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস বিরোধী দলগুলির মধ্যে একটা আঁতাত হয়। তেমনি হয় মহারাষ্ট্রে ভাষাভিত্তিক প্রদেশের দাবীতে। আমি ছিলাম দুইয়েরই সমর্থক। সারা ভারতের প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের সভায় এই মত গৃহীত হয়। মহারাষ্ট্রের নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হয়। জওহরলালজী একে ভাষা উন্মাদনা বলে উড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু যখন বুঝলেন এ মত ধরে থাকলে মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস লোপ পাবে তখন নতি স্বীকার করেন। ভাষাভিত্তিক মহারাষ্ট্র মেনে নেন। এই ব্যাপারে গুজরাটীদের উপর একদল মারাঠী গুণ্ডার অত্যাচার খুবই বেদনাদায়ক ও লজ্জাকর। পশ্চিম বাংলা বিধানসভায় কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ। কমিউনিস্ট পার্টি বৃহত্তম বিরোধী দল। তার পরই প্রজাসমাজতন্ত্রী দল। এই দলের নেতা নির্বাচিত হই আমি। বিধানসভায় ঘোষণা করি যে স্বাধীন দেশে যে দলই সরকার গঠন করুক তার সঙ্গে যথাসম্ভব সহযোগিতা করা, নিতান্ত প্রয়োজনে অসহযোগিতা করা এই আমাদের নীতি। একথা অস্বীকার না করলেও যখন তখন আন্দোলন করা ছিল আমাদের দলের কারো কারো বাতিক। এতে দল দুর্বল হয় এই ছিল আমার

মত। বিধানসভায় আমি কখনো কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করিনি। প্রস্তাবের গুণাগুণের উপর যুক্তি দিয়ে নিজের বক্তব্য রেখেছি। আর সভায় অধিকাংশ সময় উপস্থিত থেকে বেশী সংখ্যক সদস্যের বক্তৃতা শুনেছি। আমিও সকল দলের এবং স্পীকার শংকরদাস ব্যানার্জির কাছে পেয়েছি হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার। ধন্যবাদ সবাইকে। কিন্তু বিধানসভায় গণতন্ত্রের আবহাওয়ার অভাব বোধ করি। একদিন যা ঘটে তার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। কমিউনিস্ট ব্লক হতে পায়ের চপ্পল ছুঁড়ে মারে মন্ত্রীদের। এক মন্ত্রীও সেই চপ্পল ফিরিয়া মারে কমিউনিস্টদের। তারপর মাইক ভেঙ্গে ছুঁড়ে মারে কমিউনিস্টরা। সৌভাগ্য কেউ আহত হননি। প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের সভ্যরা সবাই চুপচাপ বসেছিল। কেউ কিছু করেনি। গোলমাল থামলে আমি দুই দিককেই ক্ষমা চাইতে বলি। যদি তা না হয় বিধানসভার নেতা ডাঃ রায়কে সবার পক্ষ হতে ক্ষমা চাইতে অনুরোধ করি। ডাঃ রায় সেদিন ক্ষমা চান না। তবে পরের দিন চান।

১৯৫৭ সালে পূজার ছুটির সময় যাই রাজস্থান ও গুজরাট সফরে। সঙ্গী সাধনা ও তার স্বামী সমর। রাজস্থানে জনগণের অপরিসীম দারিদ্র্য দেখে ব্যথিত হলাম। কিন্তু বুঝলাম রাজস্থান একটি কৃষ্টিময় স্থান। এখানে শুধু রাণা প্রতাপ জন্মাননি জন্মেছেন কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা মীরাবাই। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি গুজরাটের অন্তর্গত কাথিয়াওয়াড়ে, দ্বারকা-প্রভাস অতি মনোরম স্থান। আর কাথিয়াওয়াড়ের লোক বেশ রসিক। মাঠে একজনকে 'কি অবস্থা' জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেলাম "খাওয়া পরার মিলছে না আর সব ঠিক আছে।" ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে যাই ইজরায়েলে এক শিক্ষা সেমিনারে যোগ দিতে। ১৯৫৭ ডিসেম্বর—১৯৫৮ জানুয়ারী পর্যন্ত মোট ১৫ দিন ছিলাম এ দেশে। পূর্বেই বলেছি, যে দল শতকরা যত ভোট পায় সেই অনুপাতে পার্লামেন্টে আসন পায়।

এখানে চাষী জমির মালিক নয়। জমির মালিক রাষ্ট্র। যতদিন চাষ করে ততদিন চাষী জমির ফসল ভোগ করে। সে জমি বিক্রী করতে পারে না। দুই রকম চাষের ব্যবস্থা :—(১) যৌথ খামার (২) ব্যক্তিগত খামার। দুই জায়গায়ই অতিথি হয়েছি। খাওয়া থাকার ব্যবস্থা পাশ্চাত্যের চেয়ে ভাল। সর্বোচ্চ আয় সর্বনিম্ন আয়ের মাত্র চার গুণ। সবাই সুষম খাদ্য পায়। ময়লা কাপড় পরা কোন লোক বা ভিখারী দেখিনি এই কয় দিনে। গ্যাসে রান্না, টানা পায়খানা, বৈদ্যুতিক আলো, পাকা রাস্তার ব্যবস্থা হয়েছে শতকরা ৯৯ জন অধিবাসীর জন্য। সারা দেশে বৈদ্যুতিক আলোর জন্য এক হারে টাকা দিতে হয়। রাজধানী টেল য়্যাভিভে আমাদের যেখানে রেখেছিল সেখানকার কমোড পরিষ্কার যারা করত তাদের প্রাতরাশ দেখেছি এইরূপ: প্রথম চার আউন্স গ্লাসের এক গ্লাস ফলের রস, তারপর পাউরুটি মাখন, একটা মুরগীর ডিম ও দুধ। বল্‌ল ১১ মাস ফলের রস দিতে পারে, একমাস দেয় টমাটোর রস। শিক্ষার মাধ্যম হিব্রু সর্বস্তরে। জার্মান ইহুদী অধ্যাপক আণবিক বিজ্ঞান পড়াচ্ছেন হিব্রু ভাষায়। এই ভাষায় বই না থাকায় অধ্যাপক হিব্রুতে নোট লিখে তার প্রতিলিপি করে ছাত্রদের দিচ্ছেন। এদের বৈজ্ঞানিক সংস্থা ভাইজমান ইনষ্টিটিউট দেখে মুগ্ধ হলাম। কি মনোরম পরিবেশ! আণবিক গবেষণা হচ্ছে। ভারী অম্লজান ($O_{১৭}$) তৈরী করছে। বহুদেশ হতে লোক এসেছে। তাই ঘর-বাড়ীর অভাব। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী চার কামরার ফ্ল্যাটে বাস করেন। এমন সমৃদ্ধিশালী সাম্যবাদী দেশ দেখিনি। এরা মরুভূমিকে উদ্যানে পরিণত করেছে। নিজেরা খেয়েও প্রচুর ফল ডিম রপ্তানি করে। শিল্প-ক্ষেত্রেও দেখলাম এদের 'ব্রোমিন' তৈরীর কারখানা। কি সুন্দর করে রেখেছে জেরুজালেম শহর। সেখানেই সাক্ষাৎ হয় প্রধান মন্ত্রী বেনগুরিয়ণের সঙ্গে। রাষ্ট্রপতি শিক্ষা সেমিনারের সবার সঙ্গেই সাক্ষাৎ করেন টেল য়্যাভিভে। দৃঢ়

সংকল্প নিয়ে নিষ্ঠা সহকারে পরিশ্রম করলে একটা জাতি কি করতে পারে তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ইজরায়েল। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষাবিদ্ ও সকল স্তরের লোকের কাছে পেয়েছি প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার।

অনেকের ধারণা আমেরিকার ধনী ইহুদীদের প্রচুর টাকা পেয়েছে এরা, তাই এরূপ হয়েছে। তা ভুল। এরা সব টাকা ধার করেছে। সুদ ত শোধ দিচ্ছেই এমন কি আসলও কতক পরিমাণে। ভারত হতে আগত ইহুদীরা যেখানে ছিল সেখানেও নিয়ে গিয়েছিল আমাকে। ভারতে তাদের উপর কোন অত্যাচার হচ্ছিল কি জিজ্ঞাসা করি। খুব জোর সহকারে 'না' বলে। ইহুদীদের একটা দেশ হচ্ছে তাই এসেছি বলে।

১৯৫৯-'৬০ এই দুই বছর আমার জীবনের বেশ ঘটনাবহুল সময়। ১৯৫৯ সালে যাই কেরলের নির্বাচনে বহু সভায় বক্তৃতা দিতে। সব সভায় সাধনার গান সবাইকে মুগ্ধ করে। প্রজাসমাজতন্ত্রী দল নেতা পট্টম থাম্নু পিল্লাই। নির্বাচনে জয়ী হয়ে কংগ্রেস সভ্যদের সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রী হন। এই নির্বাচনের জন্য পশ্চিম বাংলা হতে দশ হাজার টাকা সংগ্রহ করে দেই।

১৯৬০ সালে দ্বিতীয়বার কেদার-বদরী ধামে যাই। সঙ্গী সাধনা ও সমর। এই যাত্রায় বিশেষ ঘটনার উল্লেখ পূর্বে করেছি। তীর্থযাত্রা শেষ করে ফিরে এলেই বুঝি পশ্চিম বাংলার খাদ্য পরিস্থিতি সঙ্কটজনক। তখন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় ও খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে দেখা করে সমস্যা সমাধানের রাস্তা বের করা হয়। পশ্চিম বাংলায় সেই বৎসরের খাদ্যের অভাব স্থির হয় ১৫ লক্ষ টন। সে অভাব সহজে মিটতে পারে যদি উড়িষ্যা তার উদ্বৃত্ত চাউল দেয়। উড়িষ্যার খাদ্যমন্ত্রী বিরোধী হলেও জওহরলালজী ও কেন্দ্রের খাদ্যমন্ত্রী পাতিল আমাদের মত যুক্তিযুক্ত মনে করায় সে ব্যবস্থা হয়। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় ও আমার মধ্যে যে লিখিত চুক্তি হয় তা ঘোষ-রায় চুক্তি নামে খ্যাত। তাতে দুই একর পর্যন্ত জমির মালিকদের

সেচবিহীন এলাকায় খাজনা মাপ দেওয়া হয়। পশ্চিম বাংলায় এই প্রথম অজন্মার জন্য খাজনা মাপ।

এই সময় একদিন কোন খবর না দিয়ে অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত লোকভারতীতে আসেন। তাঁর বিনয় ও নম্রতাপূর্ণ ব্যবহারে খুব খুশি হই। তিনি ছিলেন গান্ধী নীতিতে পুরা বিশ্বাসী। ক্রমে তাঁর সঙ্গে হয় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আমার চেয়ে বয়সে ছোট হলেও অনেকদিন হল কর্কট রোগে তাঁর দেহত্যাগ হয়েছে। দুঃখ হয়েছিল খুবই তাঁর মৃত্যুতে। তাঁর মারফতে কবিশেখর কালিদাস রায়ের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়। দুঃখের বিষয় অনেকদিন শয্যাগত থেকে ১৯৫৫ সালে তাঁরও দেহত্যাগ হয়েছে।

১৯৫১ সালে সাধনার বিশেষ তাগিদে মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে বাংলায় বই লিখতে আরম্ভ করি। ১৯৫২ সালে তা ছাপা হয়। এই বইয়ের ইংরেজী ও হিন্দী অনুবাদ ছাপা হয়েছে।

১৯৫০ সালে আসামে একটি অতি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলন অতি হীনস্তরে এসে পৌঁছে। আসামের বাংলাভাষীদের গৃহদাহ, লুঠ, হত্যা, নারী নির্যাতন প্রভৃতি সবই হয়। আসাম সরকার এমনকি ভারত সরকারও অযোগ্যতা দেখায়। পশ্চিম বাংলা সরকারও দুর্বলতা দেখায়। লজ্জার কথা এই যে, আসামের কোন রাজনৈতিক দল এমন কি ভূদান কর্মীরাও এর নিন্দা করে না। প্রাদেশিক সংকীর্ণতা সব প্রদেশেই কম-বেশী আছে কিন্তু আসামের মত সংকীর্ণতা ভারতের আর কোথাও দেখিনি। পরম বৈষ্ণব শ্রীমন্ত শঙ্কর দেবের দেশ কি করে এমন হল ভেবে বিস্মিত হই। ১৯৫৪ সালে নওগাঁ জিলার বড়দোয়ায় শঙ্করদেবের ছত্র ও নামঘর দেখে ও কীর্তন শুনে আনন্দ পাই। আসামের কীর্তন বাংলার কীর্তনের চেয়ে মধুর মনে হল। সেখানে উপহার পাওয়া শঙ্করদেবের 'কীর্তন ঘোষা' ও তাঁর প্রধান শিষ্য মাধবদেবের 'নমঘোষা' পড়ে খুব

ভাল লাগে। আজকের আসাম শঙ্করদেব ও মাধবদেবের ভাবধারা অনুসরণ করুক এই প্রার্থনা সর্বান্তঃকরণে।

১৯৬২ সালে নূতন নির্বাচন হওয়ার কথা। তার পূর্বেই রায় মন্ত্রীসভার একটা কাজে বিশেষ দুঃখিত ও চিন্তিত হই। দেখলাম এঁরা গুণীলোকের চেয়ে টাকাওয়ালা লোককে বেশী সম্মান দেন। সুখলাল করণানী প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে ১৮ লাখ টাকা দেন। সমস্ত হাসপাতালের নূতন নামকরণ হয় সুখলাল করণানী হাসপাতাল। এই হাসপাতালে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে গবেষণা করে স্যার রোনাল্ড রস নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর নামে হাসপাতাল হল না। সুখলাল করণানীর টাকায় যে কয়টা ওয়ার্ড হয়েছিল তা তাঁর নামে করা যেত। রাষ্ট্রের মন্ত্রিসভা যদি গুণীলোকের চেয়ে টাকাওয়ালা লোককে বেশী সম্মান দেন তবে সেই রাষ্ট্রের ডুববার পথ পরিষ্কার হয়।

১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে ভারতের উঃ পূঃ সীমান্তে চীনা আক্রমণ সুরু হয়। জাতির এই সংকটময় সময়ে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ ভুলে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলকাতায় ময়দানের জনসভায় একযোগে আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য যথাসাধ্য করতে সকলকে আহ্বান জানাই। জাতির মধ্যে লক্ষ্য করি বেশ সাড়া। কিন্তু আমাদের সৈন্য পরিচালনায় ত্রুটির জন্য ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। চীনা সৈন্য নেফা অঞ্চলে ফুটহিল দখল করে। মনে হয়েছিল যে কোন সময় চীনারা তেজপুর দখল করবে আর সেখান হতে আসাম। কিন্তু চীনারা পিছিয়ে যায়। এরপর যাওয়ার সুযোগ ও ব্যবস্থা হলেই তেজপুর ও ফুটহিল যাই। দুই স্থানেই জনসভায় ভাষণ দেই। ১৯৬৪ সালের ২৬শে জানুয়ারী ফুটহিলে স্থানীয় লোকদের সভায় জনগণকে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংকল্পবদ্ধ হতে আবেদন জানাই। এই চীনা আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে জওহরলালজী ঘোষণা করেন যে, তিনি

আমাদের সেনাপতিদের নির্দেশ দিয়েছেন চীনাদের ভারতভূমি হতে তাড়িয়ে দিতে। চীনারা তখন কাশ্মীরে লাডাক অঞ্চলে বেশ খানিকটা স্থান দখল করেছিল তাদের সেখান হতে তাড়ান ত হয়ইনি তারা অন্য সীমান্তে ভারতকে আক্রমণ করে অপদস্থ করে। চীনারা আজও আছে লাডাক অঞ্চলে। তা খুবই বেদনাদায়ক।

১৯৬২ সালে সেপ্টেম্বরে বিনোবাজী আসেন পশ্চিম বাংলায়। বিভিন্ন জিলায় এগার মাস সফর করেন ভূদান আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে সভাপতি করে অভ্যর্থনা সমিতি হয়। ভূদানকর্মী, গান্ধীনিধি, অভয় আশ্রম প্রভৃতি গঠন-মূলক সংস্থার অধিকাংশ কর্মী এ কাজে এগিয়ে আসেন কিন্তু আমি প্রাণে সাড়া পাই না বলে চুপ করে থাকি। বন্ধুদের সঙ্গে তফাৎ হলে বরাবরই আমি কোন প্রকাশ্য বিবৃতি দেই না, দূরে সরে থাকি। কুমার জানাকে সব কথা খুলে বলি।

বিনোবাজীর সফরের ফল হল নৈরাশ্যজনক। পলাশী গ্রামদান হলে বাংলা বিজয় হবে বলেন তিনি। তাই কোনরকমে পলাশী গ্রামদান ঘোষিত হল। অর্পণ পত্র হল না। জয় শেষ পর্যন্ত হল পরাজয়। গান্ধীনিধির প্রধান কেন্দ্র বর্ধমান জিলার সেনপুরের পাশাপাশি এগারখানা গ্রামদান ঘোষিত হল। একখানারও অর্পণ পত্র হল না। সূতাহাটা থানা অঞ্চলে কুমারবাবু ১৯ খানা গ্রামদান ঘোষণা করলেন। অর্পণ পত্র হল মোটে একটির। এই একটিরও পরবর্তী কাজে কুমারবাবু ছিলেন খুব ব্যথিত ও লজ্জিত। বলরামপুর অভয় আশ্রমের চারপাশে ১২টি গ্রামদানও অর্পণ পত্র হল। কিন্তু এইসব গ্রামের অধিবাসীরা গ্রামদানের মৌলিক বিষয়গুলিও উপলব্ধি করেছে বলে মনে হয় না। কি রাজনীতি কি গঠনমূলক কাজ সব দিকেই দেখি অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। ১৯৬৩ সালে নভেম্বর মাসে সবরমতী আশ্রমে গান্ধীনিধির বিভিন্ন প্রদেশের সভাপতি ও সম্পাদকের সভায় আমার মতের অভিব্যক্তি

দেই। তা জোর দিয়ে বলি ১৯৬৪ সালে জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত গান্ধীনিধির অছিমণ্ডলীর সভায়। জওহরলালজীর জীবিতকালে গান্ধীনিধির অছিদের এই শেষ সভা। তিনি উপস্থিত ছিলেন। গান্ধীনিধির সম্পাদক জি রামচন্দ্রন তাঁর রিপোর্টে বলেন নিধির তরফ হতে কাজ ভাল হচ্ছে। সভাপতির অনুমতি নিয়ে আমি বলি —"আমরা বলছি গান্ধী নিধির কাজ ভাল হচ্ছে। বিনোবাজী বলছেন ভূদান আন্দোলনের কাজ বেশ ভাল চলছে, সরকার বলছে তাদের পরিকল্পনার কাজও ভাল হচ্ছে। অথচ দেশে আজ শতকরা ৯৮ জন নিম্নতম সুষম খাদ্য পায় না। অতএব আমাদের গুরুতর ক্রুটি রয়েছে কোথাও। তা বের না করে শুধু আত্মপ্রশংসা করে কোন লাভ হবে না। আমাদের বের করা উচিত ক্রুটি কোথায়। তবেই দেশের সত্যিকারের কল্যাণ করতে পারব। নতুবা সবই হবে নিরর্থক।" এরপর সভাপতি তখনকার মত সভা স্থগিত করেন। এ বিষয়ে আর আলোচনা হয় না।

১৯৬৪ সালে সাধনা একখানা কৃষ্টিমূলক আদর্শবাদী বাংলা মাসিক পত্রিকা বের করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ঐ সালেই তার সম্পাদনায় লোকসেবা পরিষদের তরফ হতে 'সবিতা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বেরোয়। এ কাজে আমিও তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করি। এ পত্রিকা সম্পাদনায় সাধনা খুব যোগ্যতার পরিচয় দেয়। সুখের বিষয় এ পত্রিকা পরিচালনায় কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ও লেখকের অকুণ্ঠ সাহায্য পাওয়া যায়। পত্রিকাখানি অনেক সাহিত্যিকের প্রশংসা লাভ করে। দুঃখের বিষয় পাঁচ বছর চলার পর পত্রিকাখানা নানাকারণে বন্ধ করে দিতে হয়।

১৯৬৫ সালে মার্চ মাসে ভারতে নেপালের রাষ্ট্রদূত যদুনাথ খানালের আগ্রহে ও ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রের অতিথি হয়ে নেপাল যাই। নিমন্ত্রণ ছিল আমার, সাধনার ও সমরের। সমর যেতে পারেনি। যদুনাথ লণ্ডনে সাধনার সহপাঠী। সে ও তার স্ত্রী কমলা এমনভাবে

ব্যবহার করত যেন তারা আমাদের পরিবারের লোক। নেপালে ছিলাম ১২ দিন। রাজা মহেন্দ্র, রাণী রত্নাদেবী, যুবরাজ বীরেন্দ্র (বর্তমানে রাজা), মন্ত্রিসভার চেয়ারম্যান সূর্য বাহাদুর থাপা, শ্রেষ্ঠ কবি বালকৃষ্ণসম (ইনি নেপালের সেক্সপিয়র বলে অভিহিত হন), বহু সরকারী কর্মচারী, শিক্ষাবিদ্ ও সাধারণ লোকের খুব হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহারই পাই।

সব দেখে মনে হল নেপাল একটি দরিদ্র কিন্তু কৃষ্টিসম্পন্ন দেশ। কৃষ্টির দিক দিয়ে ভারতের সঙ্গে এর অতি নিকট সম্পর্ক। সূর্য বাহাদুর থাপা সাক্ষাতের সময় বলেন যে, নেপালে যিনি (১) কেদারবদরী, (২) দ্বারকা প্রভাস, (৩) কন্যাকুমারিকা, রামেশ্বর ও (৪) পুরী এই চারধাম গিয়েছেন তিনি পুণ্যবান বলে গণ্য। আমি বলি—"আমরা এই চারধাম দেখেছি এবার এসেছি পঞ্চমধাম পশুপতিনাথ দেখতে।" অমনি থাপাজীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল। বুঝলাম এইখানেই ভারত ও নেপালের মিলনক্ষেত্র। নেপালে পরম সৌভাগ্য হয় বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী উদ্যান ও সেখানকার বুদ্ধমন্দির দেখা। ভৈরব হাওয়াই বন্দর হতে যাওয়ার রাস্তা এত খারাপ ছিল যে, মনে হল বুদ্ধের দয়ায়ই বেঁচে এসেছি। নূতন রাস্তা তৈরী হচ্ছিল। অযত্ন বঞ্চিত পুরানো রাস্তা দিয়েই জীপে যেতে হয়েছিল। তখন নেপালে ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীমন নারায়ণ ও তাঁর স্ত্রী যমুনালালজীর মেয়ে মাদালসা এবং মহাত্মাজীর সঙ্গে সেবাগ্রামে ছিল তখন নেপালে খাদি কর্মী তুলসী মেহেরার কাছ থেকে পাই সর্ব প্রকারের সাহায্য ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার। দুঃখের বিষয় রাজা মহেন্দ্র ও তুলসী মেহেরা আজ জীবিত নেই।

১৯৬৬ সালে পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের একদল অজয় মুখার্জি (প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার ছাত্র ছিল ১৯১৯ সালে) ও হুমায়ুন কবীরের নেতৃত্বে বাংলা কংগ্রেস গঠন করে। আমি এই সংস্থায় যোগ দিই না। যতটা সম্ভব সাহায্য করি। ১৯৬৭ সালে যে

সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলি একযোগে কাজ করে। এদের সমর্থনে নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে ঝাড়গ্রাম হতে দাঁড়াই। কুমারবাবুর সমর্থন ছিল আমার পেছনে। কংগ্রেসপ্রার্থী ঝাড়গ্রামের রাজকুমার বীরেন্দ্র বিজয় মল্লদেবকে পরাজিত করে জয়ী হই। এই নির্বাচনে কংগ্রেস পশ্চিম বাংলার প্রথম সংখ্যা-লঘিষ্ঠ। বিরোধী দল নেতাদের কয়েকজন বিশেষ করে কমিউনিষ্ট নেতারা চান অজয় মুখার্জিকে মুখ্যমন্ত্রী করতে। তার মন্ত্রিসভায় যোগ দিব কিনা এ প্রশ্ন ওঠে। আমার মনে দ্বিধা ছিল। হুমায়ুন কবীরের বিশেষ ইচ্ছা আমি যোগ দেই। শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের অধিকাংশ যোগ দেওয়ার পক্ষে। কিন্তু যাদের মতের খুব মূল্য দেই এমন দুইজন বিশিষ্ট হিতাকাঙ্ক্ষী বিরুদ্ধে মত দেয়। অবস্থার চাপে খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করি। কিছুদিন পরেই বুঝি এবং আজও মনে হয় এই মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়ে ভুলই করেছিলাম। এই মন্ত্রিসভা 'প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা' নামে খ্যাত। মন্ত্রিসভা গঠনের পর কলকাতা ময়দানে কয়েক লক্ষ লোকের এক বিরাট সভা হয়। তাতে আমিও বক্তৃতা দিই। স্পষ্ট বলি যে, এই মন্ত্রিসভার বিভিন্ন দলকে নিজ নিজ দলের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা না করে জনকল্যাণকে প্রথম স্থান দিতে হবে। তবেই-যুক্তফ্রণ্ট সার্থক হবে। নতুবা জনগণ আমাদিগকেও কংগ্রেসের ন্যায় গঙ্গাজলে বিসর্জন দিবে। দুঃখের বিষয় জনকল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি।

খাদ্যমন্ত্রী হয়ে আমি ধানের দর বাড়াবার প্রস্তাব করি। এর পূর্বে প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সময় ধানের দর ছিল মণকরা ১৪, ১৫ ও ১৬ টাকা। আমাদের মন্ত্রিসভা অনুমোদন করে মণকরা ২১, ২২ ও ২৩ টাকা। আমার মতে খাদ্য বিষয় দলগত রাজনীতির ঊর্ধ্বে। তাই এই প্রস্তাব বিধানসভায় উপস্থিত করি। কংগ্রেসদলও প্রস্তাব সমর্থন করে। এটা শুধু বিধানসভার প্রশ্ন নয়। আমার মনে হয় সবচেয়ে ভাল হবে যেদিন উৎপাদক, ক্রেতা ও সরকারের প্রতিনিধি

মিলে অত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করবে।

সকল দলের সমর্থিত এই প্রস্তাবেরও বিরোধিতা আরম্ভ করে কোন কোন দলের কিছু কিছু লোক। তাই জুলাই মাসের প্রথম দিকেই বুঝি যুক্তফ্রণ্টে আমার মন্ত্রিত্ব করা চলবে না। অজয়ের কাছে গিয়ে আমার পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করি। অজয় বলে—"যখন যাওয়ার হবে দু'জন একত্রেই যাব।" কংগ্রেস দলের সঙ্গে তার আলাপের কথা শুনি। ২রা অক্টোবর মহাত্মাজীর জন্মদিনে অজয় পদত্যাগ করবে এ খবর বিশ্বস্ত সূত্রে পাই। কিন্তু তা হয় না। কেন তা বলতে পারি না। এরপর একদিন একটি বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে। সচিবালয়ে একজন কর্মচারী মুখ্যমন্ত্রীকে মাথায় থাপ্পড় দেয়। আমি তখন সচিবালয়ে ছিলাম না। তার পরের দিন যেয়ে একান্তে অজয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলি—"হয় শাস্তি দেওয়া হোক অথবা মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত।" কোনটাই হয় না। এরূপ ঘটনা পশ্চিম বাংলায় আর কোন মুখ্যমন্ত্রীর আমলে হয়নি। এটা প্রথম যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার চিরকলঙ্ক। আমার মন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যায়। পদত্যাগ করাই স্থির করি। তা পেশ করি নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এবং যথারীতি গৃহীত হয়। এর মধ্যে একদল সদস্য একজোট হয়। হুমায়ুন কবীরও অজয়ের সঙ্গ ত্যাগ করে। আশুতোষ ঘোষ কয়েকজন যুক্তফ্রণ্ট বিরোধী এম. এল. এ. কে বাড়ীতে স্থান দেয়। কংগ্রেসদলও চায় যুক্তফ্রণ্টের পতন। এইসব সদস্য একত্রে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়। তাঁরা আমাকে মুখ্যমন্ত্রী করতে চান। কংগ্রেসই বড় দল। বাকী সব মিলিয়ে হয় গণতান্ত্রিক দল। নবেম্বর মাসেই মুখ্যমন্ত্রী হয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করি। প্রথম শুধু গণতান্ত্রিক দলের সদস্য থাকেন মন্ত্রিসভায়, পরে যোগ দেন কংগ্রেস সদস্যরা। মুখ্যমন্ত্রী হয়ে সাত দিনের মধ্যে বিধানসভা আহ্বানের ব্যবস্থা করি। বিধানসভা চলাকালে বিরোধী দলের দিক হতে মাইক ভেঙ্গে ছুড়ে

মারে আমার উপর। আঘাত পাই, সৌভাগ্যক্রমে হাসপাতালে যেতে হয়নি। কে ছুঁড়ে মেরেছিল তা সঠিক নির্ণয় করতে না পারায় কারো বিরুদ্ধে কিছু করা হয় না। স্পীকার রুলিং দিয়ে বিধানসভা চলতে দেন না। ইহা অসঙ্গত। স্পীকার বিধানসভার উর্ধ্বে নন। বিধানসভা সকলের উপর। তারপর স্পীকার বিজয় ব্যানার্জির তরফে লোকজন খবর দেয় যে, তাঁর বাড়ীতে হামলা হয়েছে। বিজয় বাবুর বাড়ীতে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করি যেন কোনরূপ জুলুম হতে না পারে।

অন্যদিকে অজয় মুখার্জি সমেত যুক্তফ্রণ্টের কোন কোন নেতা সচিবালয় ত্যাগ না করার ঘোষণা প্রথম করে, কার্যতঃ আরম্ভ করে আইনভঙ্গ। কিন্তু ১৫ দিনের মধ্যেই অবস্থা স্বাভাবিক হয়। দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা হওয়ার পর এই সময়কার দুইটি ঘটনার বিচারের জন্য এক-জজের কমিশন বসায়। জজ একটিতে পুলিশের আচরণ ঠিক মনে করেন আর একটিতে পুলিশের কিছু ক্রটির কথা বলেন। কিন্তু ক্রটির বেলায়ও আমার বিরুদ্ধে আনীত কোন কোন দলনেতার উপর অত্যাচারের নির্দেশের কোন প্রমাণ নেই বলেন। আমি এরূপ কোন নির্দেশ দেইনি। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। আমাদের এই মন্ত্রিসভা মাত্র তিন মাস স্থায়ী হয়। তার প্রধান দুর্বলতা ছিল আশুতোষ ঘোষের মন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছা। আমি স্পষ্ট বলে দেই যে, যতদিন কংগ্রেস সরকার কর্তৃক আনীত দুর্নীতির অভিযোগ হতে তিনি আদালতে মুক্তি না পান ততদিন এ কথা উঠতেই পারে না। দ্বিতীয় হল দিল্লীর কংগ্রেসের প্রভাবশালী মহলে কমিউনিষ্টদের প্রতি সহানুভূতি। হয় গবর্ণরের শাসন প্রতিষ্ঠিত।

এই মন্ত্রিসভার সময় মুখ্যসচিব মৃগাঙ্কমৌলী বসু, একান্ত সচিব সুধীরমাধব বসু, সাধনা সোম বিশ্বস্ত সহকারী। এই তিনজনের কাজেই আমি বেশ সন্তুষ্ট। কিন্তু দুঃখের বিষয় মৃগাঙ্ক আজ আমাদের মধ্যে নেই। তার মৃত্যুতে নিতান্ত আত্মীয়-বিয়োগ ব্যথা অনুভব করি।

১৯৬৮ সালে নির্বাচনের পূর্বে আমার মনে হয় কংগ্রেসে যোগ দিয়ে কাজ করাই ভাল। গণতান্ত্রিক দলের কার্যকরী সমিতি অধিকাংশের ভোটে এই প্রস্তাব পাশ করে। হুমায়ুন ও আশুতোষ ঘোষ তা মানে না। তারা পৃথক পৃথক ভাবে প্রার্থী দাঁড় করায়। তাদের একজন প্রার্থীও জয়ী হয়নি। কংগ্রেসও সংখ্যালঘিষ্ঠ। দুঃখের কথা হুমায়ুনও আজ আমাদের মধ্যে নেই।

এই নির্বাচনের পর দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়—মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি। এই সময় ওপরে গঠনমূলক কাজকে নষ্ট করার এক বিশেষ অভিযান হয়। আমাদের লোক ভারতীর কথা ছেড়েই দিচ্ছি। রামকৃষ্ণ মিশনের নরেন্দ্রপুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর অনেক জবরদস্তি হয়। আরো যা হয় তা খুব বেদনাদায়ক। গোলপার্কে স্বামী বিবেকানন্দের প্রস্তর মূর্তিতে আলকাতরা মাখায়। কলেজ-স্কোয়ার বিদ্যাসাগরের ও আচার্য রায়ের মূর্তি ভাঙ্গে। প্রেসিডেন্সী কলেজে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের দেয়ালে প্রথিত মূর্তি বা প্লাক লাঞ্ছিত। অবশ্য আজ অজয় মুখার্জি কংগ্রেস দলভুক্ত। ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী হতে '৭৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত কলকাতায়ই থাকি বিভিন্ন স্থানে। ১৯৬৯ সালে ডানদিকে হার্নিয়া রোগে আক্রান্ত হই। রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান হাসপাতালে ভর্তি হই। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ ও আরো কয়েকজন সাধুর সঙ্গে হয় ঘনিষ্ঠতা। ভগবানের অনুগ্রহ ভিন্ন কি বলব। এইখানে থাকতেই লিখতে আরম্ভ করি জগদ্‌গুরু বিবেকানন্দ। তা প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে। এ কাজেও উৎসাহ পাই কোন কোন সাধুর কাছে।

ডাঃ সুবীর চ্যাটার্জি খুব ভালভাবেই অস্ত্রোপচার করেন। ধন্যবাদ তাঁকে।

অস্ত্রোপচারের পর একটু সুস্থ হলে এলাহাবাদ ও কাশী যাই স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য। এলাহাবাদে ছিলাম সাধনার খুড়াশ্বশুর

৺ক্ষিতীন্দ্র মিত্রের বাড়ীতে। সাধনার এক দেবর আমাদের ষ্টেশন হতে এসেই জিজ্ঞাসা করে—"কি হচ্ছে পশ্চিম বাংলায়।" আমি বলি—"স্বাধীনতা লাভের পর দেশে যা কিছু ভাল হয়েছে তার জন্য কৃতিত্ব প্রথম ভারতের প্রধান মন্ত্রীর তারপরে বিভিন্ন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীদের। আর যা কিছু খারাপ হয়েছে তার জন্য অগৌরবও তাঁদের। এ পর্যন্ত ভারতে তিনজন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। দুজন এলাহাবাদ শহরের আর একজন এলাহাবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তোমরা এলাহাবাদের লোক যদি ভাল হয়ে থাক তোমরাও সে গৌরবের ভাগী আর যদি খারাপ হয়ে থাক তবে অগৌরবের ভাগীও তোমরা। এখন বল কি হয়েছে।" এর কোন উত্তর না দিয়ে সে বাড়ীর ভিতরে চলে যায়। এই বাড়ীর সবার বিশেষ করে সাধনার খুড়ী-শাশুড়ী নন্দরাণী মিত্রের যত্নে শরীর শীঘ্রই ভাল হয়ে ওঠে। নন্দর দাদা বীরেন ঘোষ ও তার স্ত্রী অনিমাও খুব নজর রাখত আমার দিকে। অনিমা খুব ভাল রাঁধুনী। এলাহাবাদ হতে যাই কাশী। থাকি রামকৃষ্ণমিশন সেবাশ্রমে। এখানেও সাধুদের কাছে পাই হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার। সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয় অদ্বৈত আশ্রমের স্বামী স্বয়ম্প্রভানন্দের সঙ্গে। দুঃখের বিষয় তিনিও আর আমাদের মধ্যে নেই। বহুদিন পর গুরুদার সান্নিধ্যে থাকার ও তাঁর সঙ্গে আলাপের সৌভাগ্য হয়। কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরও ভাল করে দেখবার সৌভাগ্য হয়।

১৯৭০ সালে ২৪শে ডিসেম্বর ৮০ বছরে পদার্পণ করি। জন্মদিন পালিত হয় রামকৃষ্ণ মিশনের ইনস্টিটিউট অব কালচারে। সেখানে আমার পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজনীতি হতে অবসর গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করি। ঐ দিন বেলুড় মঠ হতে আমাকে ফুল সমেত ঠাকুরের প্রসাদ ও একখানা মুগা চাদর পাঠান। আমি তা জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ উপহার বলে মনে করি। এর পূর্বে আরো তিনটি শ্রেষ্ঠ উপহার পাই। প্রথম শ্রেষ্ঠ উপহার দেয় সাধনা। কালাডি হতে

আদি শঙ্করাচার্যের অতি সুন্দর ছবি এনে বাঁ আমার জন্মদিনে উপহার দেয়। ঐরূপ ছবি তখন কলকাতায় পাওয়া যেত না। এখন কখনো কখনো পাওয়া যায়। আর দুটি হল ডাঃ বানারসী প্রসাদ কেডিয়ার দেওয়া হিন্দী ভাষ্যসমেত তুলসীদাসের রামায়ণ, আর শিবজী ভাই শেঠিয়ার দেওয়া—গুজরাটি ভক্তকবি নরসিংহ মেহতার কবিতার বই। এই জীবনের চার শ্রেষ্ঠ উপহার।

১৯৭১ সালে ঋষি অরবিন্দ বই লিখি এবং তা প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে। গান্ধী, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ এই তিন মহাপুরুষের জীবনী লিখতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। এ সবই ভগবানের অনুগ্রহ।

পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলা স্বাধীন হলে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সেখানে যাই। সঙ্গে যমুনা ও সাধনা। পৌঁছবার পরের দিন ঢাকা মিশন আশ্রমে ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে যাই। ভারপ্রাপ্ত সাধুজীর ইচ্ছায় ঠাকুর সম্বন্ধে কিছু বলি। ঠাকুর সামান্য লেখাপড়া জানতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন পরাবিদ্যার অধিকারী। যা দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মকে লাভ করা যায়। তাই আসল বিদ্যা। সাধারণ হিসাবে তিনি মূর্খ, আসলে তিনি পরম জ্ঞানী। সেই জ্ঞানই দিতে চেষ্টা করেছেন সবাইকে। গিয়েছিলাম ঢাকা, কুমিল্লা, চাটগাঁ, সাধনার জন্মস্থান হণহরা ও মামাবাড়ী সারোরাতলি। মালিকান্দা যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও হয়ে ওঠেনি। ঢাকায় কয়েকদিন ছিলাম এক কৃষ্টিসম্পন্ন মুসলমান পরিবারে। ইফতেখার আলম ও তাঁর স্ত্রী উচ্চশিক্ষিতা ডলি আলম খুব যত্ন করে। এর পূর্বে কয়েকদিন ছিলাম সৈন্যবিভাগের অফিসারদের বিশ্রাম ভবনে। কর্ণেল অশোক চ্যাটার্জি সে ব্যবস্থা করেছিল। এখানেও পাই খুব ভাল ব্যবহার।

ঢাকায় সাক্ষাৎ করি প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান ও রাষ্ট্রপতি আবু সাইদ চৌধুরীর সঙ্গে। পূর্ব বাংলা ও ভারতের মধ্যে পাশপোর্ট উঠিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করি। প্রধানমন্ত্রী রাজী হন না। সাধনা

যখন তাঁর আত্মীয়দের হত্যার কথা বলে তখন তিনি বলেন—"আমি পাগল হৈয়া যামু।" প্রধানমন্ত্রী বড় বিপ্লবী হলেও প্রশাসনিক দক্ষতা তেমন নেই মনে হয়। কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে সুদক্ষ লোক বলে মনে হল। তবে যেদিন মুজিবর রহমান সাহেবের হত্যার খবর পেলাম সমস্ত মন বেদনায় ভরে উঠল। বারবার মনে এল কবে পৃথিবী হতে হত্যা বন্ধ হবে এবং মানুষ ঠিক ঠিক সভ্য হবে। কুমিল্লায় ছিলাম কান্দিরপাড় অভয় আশ্রমে। আর চাটগাঁয় ছিলাম প্রবর্তক সঙ্ঘে। হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ এই তিন ধর্মের বহু লোকের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়। যদিও আমরা সর্বত্র ভাল ব্যবহার পেয়েছি তবু যা শুনলাম তাতে মনে হল হিন্দুরা সসম্মানে পূর্ব বাংলায় থাকতে পারবে না। আমার এই ধারণা যদি ভুল প্রমাণিত হয় তবে আমি সবচেয়ে সুখী হব। স্বাধীন পূর্ব বাংলা সরকার দেশটার নামকরণ করে 'বাংলাদেশ'। এটা কিছু বিভ্রান্তিকর। পশ্চিম বাংলাও ত বাংলাদেশ। পূর্ব বাংলার কর্তৃপক্ষের কাছে আমার নিবেদন রইল এ বিষয়ে পুনর্বিবেচনার জন্য। আর সব দেখে শুনে একথা স্পষ্ট মনে হল যে, ভারতীয় সৈন্যের সাহায্য ভিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দ্বারা পূর্ব বাংলা স্বাধীন হতে পারত না। আগরতলা হয়ে কলকাতায় আসি। ১৯৭২ সালে নভেম্বর মাসে রাজস্থানের বিখ্যাত বনস্থলী বিদ্যাপীঠে সমাবর্তন ভাষণ দিতে যাই। এইবার আরাবল্লী পর্বত বেষ্টিত রণকপুরের জৈন মন্দির দেখি। এর পূর্বে যখন রাজস্থান এসেছিলাম তখন এই মন্দিরের কথা কেউ বলেননি। এই জৈন মন্দির কোন কোন দিকে আবু পর্বতের দিলওয়াড়া মন্দিরের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। সকলেরই অবশ্য দ্রষ্টব্য। দুঃখের বিষয় বনস্থলী বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা হীরালাল শাস্ত্রী ১৯৭৪ সালে ডিসেম্বর মাসে আমাদের মধ্য হতে চলে গিয়েছেন।

বনস্থলী হতে ফিরবার পথে অযোধ্যা দেখি। দশরথ, রামচন্দ্র, ভরত, লক্ষ্মণ, কৌশল্যা, সীতা প্রভৃতির স্মৃতি বিজড়িত অযোধ্যা দেখে

ভারত ইতিহাসের এক যুগ মনের সামনে এসে গেল। সরযূ নদীর জল মাথায় দিলাম। ১৯৭৩ সালে যাই পাঞ্জাব ভ্রমণে। উদ্দেশ্য অমৃতসর, জালিয়ানওয়ালাবাগ, চণ্ডীগড়, সিমলা, চৈল, কুলু, মানালী, তাঁতপাণি প্রভৃতি দেখা। সিমলা বাদে বাকী সব স্থানই হল প্রথম দেখা। রাষ্ট্রের অতিথি ছিলাম সব জায়গায়ই। তবে সিমলার নিকটবর্তী জুতকে ছিলাম কয়েকদিন আমার জ্যেঠতাত ভাইপো শচীনের (ডাক্তার-মেজর) সঙ্গে।

জালিয়ানওয়ালাবাগে জেনারেল ডায়ারের নৃশংস কাণ্ড সব দেখে ও শুনে মন গভীর বেদনায় ভরে ওঠল। মনে হল ডায়ার সেনাপতি ছিলেন নামে কিন্তু আসলে কশাই। তবে এর ফলেই ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীনতা লাভের জন্য হল এক নব জাগরণ। ভগবান আপাত অকল্যাণের ভিতরেও লুকিয়ে রাখেন কল্যাণ। জালিয়ানওয়ালাবাগ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অমৃতসরে আনন্দ পেলাম শিখদের স্বর্ণমন্দির দেখে। মন্দিরের সব ত দেখালই, দেখাল মন্দিরের রত্ন অলংকারও। আর উপহার দিল শিখধর্মসংশ্লিষ্ট কয়েকখানা বই ও একখানা রেশমী চাদর। অমৃতসর হতে আসি চণ্ডীগড়। নূতন তৈরী শহর। দেখি এর সুন্দর গোলাপবাগ। গবর্ণর, মুখ্যমন্ত্রী, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ, সরকারী কর্মচারী প্রভৃতি সবার কাছে পাই হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার। কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও কয়েকটি জিনিসে মনে দুঃখ হল। দেশভাগের সময় পাঞ্জাব দুইভাগ হয়েছিল—(১) ভারতীয় পাঞ্জাব ও (২) পাকিস্তানী পাঞ্জাব। এখন ভারতীয় পাঞ্জাবও হয়েছে আবার তিনভাগে বিভক্ত :—(১) পাঞ্জাব, (২) হরিয়াণা ও (৩) হিমাচল প্রদেশ। তাতেও যদি জনকল্যাণ হত দুঃখিত হতাম না। কিন্তু তা হয়নি। ১৯২৯ সালে যখন প্রথম পাঞ্জাব দেখি তখনকার মত গরুর দুধ আজ নেই। আমবাগান কেটে গম ক্ষেত হয়েছে ও হচ্ছে। যেমন একদিন হয়েছিল পূর্ব বাংলায় ফলের বাগান কেটে পাট ক্ষেত।

তা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। আর গ্রাম দেখলাম নোংরা ও দুর্গন্ধময়। চণ্ডীগড়ে প্রথম কিছুদিন ছিলাম হরিয়াণার গবর্ণর বীরেন চক্রবর্তীর সরকারী ভবনে। দুঃখের কথা বীরেন চক্রবর্তীর দেহত্যাগ হয়েছে ১৯৭৬ সালে কলকাতায়।

চণ্ডীগড়ের উপকণ্ঠে চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সভাপতির ইচ্ছানুসারে মহাপ্রভুর জন্মদিনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সভায় সভাপতিত্ব করি। বক্তৃতা দেই হিন্দীতে। এই আমার মহাপ্রভু সম্বন্ধে প্রথম হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা। মঠের কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট। তারপর মঠে প্রসাদ পাই।

১৯৭৩ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের নরেন্দ্রপুর আবাসিক বিদ্যাপীঠের প্রাণস্বরূপ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ নিয়ে যান স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে। ক্রমে তাঁর সঙ্গে হয় বেশ হৃদ্যতা। তিনি সুপণ্ডিত, সুবক্তা ও প্রশাসনিক দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষাবিদ্। এর পূর্বে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষাবিভাগের এক অনুষ্ঠানে সভাপতি করে নিয়ে যান স্বামী পুণ্যানন্দ। দুঃখের বিষয় তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই।

এমনি করে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ হয়। অবশ্য প্রাণের যোগাযোগ বরাবরই ছিল। বর্তমানে মিশনের শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান বেশ কিছু হয়েছে তবু আমার মনে হয় ১৯১৩-১৬ সালের মিশন এরচেয়ে ভাল ছিল। অবশ্য আমি মনে করি ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও রামকৃষ্ণ মিশনই আজ সর্বোত্তম প্রতিষ্ঠান। তবে মিশনকে আমি আরো উত্তম দেখতে চাই। ঠাকুর মিশনের কর্তৃপক্ষকে আরো শক্তি দিবেন তাঁর আদর্শকে রূপায়িত করতে এই আশা।

১৯৭৪ সালে এপ্রিল মাসে কলকাতা ছেড়ে বারাকপুরে গান্ধী সংগ্রহালয়ে যেয়ে বাস করি পরিচালক বোর্ডের প্রস্তাব অনুযায়ী। তখন সেক্রেটারী মানসগোবিন্দ সেন। তার অবসর গ্রহণ করার

কথা। দুইজন কর্মী এসে সাধনাকে সেক্রেটারী করার কথা বলে। মানসগোবিন্দ ও তাঁর পূর্বের সেক্রেটারী ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের মত জিজ্ঞাসা করি। দুইজনেই এ প্রস্তাব পছন্দ করেন। তারপর পরিচালক বোর্ডের সভায় উপস্থিত সকল সভ্যের সমর্থনে সাধনা আবাসিক সম্পাদিকা নিযুক্ত হয় এবং আগষ্ট মাসে কাজে যোগ দেয়।

বারাকপুরে থাকার ফলে ভাল করে বুঝি যে নাথুরাম গড্‌সে মহাত্মাজীকে গুলি করে হত্যা করেছে কিন্তু তথাকথিত গান্ধীবাদীরা গান্ধীজীর সমস্ত আদর্শকে শেষ করেছে। ভগবান সবাইকে ঠিক পথে পরিচালিত করুন এ ছাড়া আর বলবার কিছু নেই।

পূর্বে সংগ্রহালয়ে বিবেকানন্দের জন্মদিনে জনসভা হত না। সাধনা তা আরম্ভ করে। আমারও সমর্থন ছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, প্রভানন্দ, রামানন্দ ও মুমুক্ষানন্দ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধান অতিথি বা বক্তা হিসাবে।

১৯৪৪ সালে ডিসেম্বরে আমাকে দ্বিতীয়বার ভর্তি হতে হয় সেবা প্রতিষ্ঠান হাসপাতালে বাঁদিকের হার্নিয়া অস্ত্রোপচারের জন্য। এবারও ডাঃ চ্যাটার্জ অস্ত্রোপচার করেন জানুয়ারী ১৯৪৫ সালে দক্ষতার সঙ্গে। প্রীতিভাজন সার্জন ডাঃ অমিয় সেন সব সময় উপস্থিত ছিল। ধন্যবাদ সবাইকে।

১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর আমার কাছে ছিল দুঃখের সময়। আমি হাসপাতালে জন্মদিনেও। শঙ্কররাও দেও ও হীরালাল শাস্ত্রীর মৃত্যুর কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। শ্রীমতী সুচেতা কৃপালানীও চলে যান এই মাসে। তবে জন্মদিনে সাধুদের সঙ্গে খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এক সাধু রান্না করেন। খুব ভাল রান্না, এমনটি এই হাসপাতালে কখনো পাইনি।

১৯৪৫ সালে একদিন সাধনার কাছে শুনি তার দাদা, দিদির সঙ্গে অল্পসময়ের জন্য তিরুপতি দর্শনের কথা। তখন আমি

নরেন্দ্রপুরে। স্বামী লোকেশ্বরানন্দও তিরুপতিদর্শন ভাল লেগেছিল বলেন। তখন মনে ইচ্ছা হয় তিরুপতি দর্শনের। লিখি মাদ্রাজের কল্কী কাগজের সদাশিবমকে। তিনি সব ব্যবস্থা করবেন জানান। ইচ্ছা ছিল যমুনা ও সাধনা দুই জনকেই নিয়ে যাই। কিন্তু যমুনা অসুস্থ থাকায় যেতে পারেনি। দুঃখ হল মনে। গিয়েছিলাম ট্রেণে। নরেন্দ্রপুরের স্বামী মুমুক্ষানন্দের সাহায্য ভিন্ন যাওয়ার সব ব্যবস্থা এক প্রকার অসম্ভব ছিল। এইবার দক্ষিণ ভারতে তিরুপতি দর্শন করতে যেয়ে থাকি তিন সপ্তাহ খানেক। তিরুপতিতে ছিলাম এক সপ্তাহ। দেবস্থানম কমিটি আমাদিগকে তাদের অতিথি করে রেখেছিল। কোন পয়সা নেয়নি। পূজার জন্য যৎসামান্য দিয়েছিলাম। তিরুপতি বালাজী ভেঙ্কটেশ্বরের মূর্তি দেখে মনে হল লক্ষ্মীনারায়ণের যুগল মূর্তি। এমনটি আর কোথাও দেখিনি। প্রতিদিনই বিভিন্ন সময় দেখতাম তিরুপতিকে একেবারে গর্ভগৃহের সামনে বসে। অভিষেকের দিন সব দেখে মনে হল যে পাথর হতে মূর্তি তৈরী হয়েছে তা সাধারণ পাথর নয়—উল্কাপাতের পাথর। বৎসরে প্রায় ৪০ লক্ষ যাত্রী আসেন দর্শনে। মন্দিরের বার্ষিক আয় প্রায় ১০ কোটি টাকা। অন্ধ্রের মন্ত্রী সত্যনারায়ণ রাজু একদিন এসে সকালে আমাদিগকে নিয়ে যান মন্দিরে। আমরা একত্র বসেই দর্শন করি। দেবস্থানম কমিটিকে সমস্ত অন্তরের ধন্যবাদ আমাদের দর্শনের অপূর্ব সুযোগ দেওয়ার জন্য।

রাজাজী ও অধ্যাপক রমণের মৃত্যুর পর এই প্রথম দক্ষিণ ভারতে যাই। রাজাজীর বাড়ীতে যে ঘরে তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল তা দেখি। শ্রদ্ধা জানাই। রাজাজীর ছেলে নরসিংহম সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে সব দেখায়। লক্ষ্মীবেনের সঙ্গেও সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়।

ব্যাঙ্গালোরে লেডী রমণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং রমণ ইনষ্টিটিউট দেখি। লেডী রমণ বেশ গুণী মহিলা। ৭টি ভাষা (তামিল,

তেলেগু, কর্ণাটকি, বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত ও ইংরেজী) জানেন। বাংলা বলেন এমন সুন্দর কথ্য ভাষায় যে বাঙ্গালী ভিন্ন কেউ এমন বলতে পারেন সে ধারণাই আমার ছিল না। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পরের দিন ৭ই নভেম্বর দেখি রমণ ইনষ্টিটিউট। সেদিন রমণের জন্মদিন। তাঁর মূর্তিকে মাল্যভূষিত করি।

মাদ্রাজে ছিলাম সদাশিবমের বাড়ী। তাঁর স্ত্রী ভারত-গৌরব সুগায়িকা শুভলক্ষ্মী। তাঁর বিনয় নম্র ব্যবহার আমার খুব ভাল লেগেছিল। আর স্বামী-স্ত্রীতে মণি-কাঞ্চন সংযোগ। স্বামী স্ত্রীকে তুলে ধরতে সচেষ্ট। স্ত্রী বলেন তাঁর যা কিছু সবই স্বামীর জন্য। এদের সংস্পর্শে এসে খুব সুখী। লেডী রমণ ও শুভলক্ষ্মীকে জানবার এই সুযোগ জীবনের পরম সৌভাগ্য।

পণ্ডিচেরী যাই এক রাতের জন্য। যাওয়ার পরই যাই শ্রীঅরবিন্দের সমাধি-স্থানে। আশ্রমের শ্রীমাও সেখানে সমাধিস্থ। খুব ভাল লাগল ফুলে সুসজ্জিত সমাধিস্থান।

এবার দক্ষিণ ভারত ঘুরে বুঝে এলাম দক্ষিণ ভারতই ভারতীয় কৃষ্টিকে বজায় রেখেছে। সব দেখে মনে হল ভারত আবার তার গরিমাময় স্থান অধিকার করবে জগতে।

মাদ্রাজ কলকাতার চেয়ে পরিষ্কার শহর। লোকেরা নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলে। কিন্তু তখন মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধির ভাষা-উগ্রতা ভাল লাগেনি। তিনি শ্রীকরুণানিধি না লিখে তিরু করুণানিধি লিখবার পক্ষপাতী। তিরু তামিল শব্দ। অর্থ শ্রী বা লক্ষ্মী। আমি কয়েকজন বিজ্ঞানের তামিল ছাত্রকে বলি 'শ্রী' সংস্কৃতমূলক শব্দ বলে যদি আপত্তির কারণ হয় তবে 'করুণানিধি'ও ত সংস্কৃতমূলক। তাঁর স্ত্রীর নাম 'দয়ালু' তাও সংস্কৃতমূলক। এক ভাষা অন্য ভাষা হতে শব্দ নিয়ে সমৃদ্ধিশালীই হয়। আর এই সব ভাষা সংস্কার নিয়ে রাজনীতিবিদ্‌দের মাথা না ঘামিয়ে সাহিত্যিকদের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

কলাবাইয়ে শঙ্করাচার্যের আশীর্বাদ লাভের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

১৯৫৫ সালে জন্মদিন পালন করি নরেন্দ্রপুরে। কাউকে চিঠি দেওয়া হয় না। সকালে গীতাপাঠ ও ভজন গান হয় ঠাকুরঘরে। দুপুরে সাধুদের সঙ্গে খাই। খুব আনন্দে দিন কাটে। সন্ধ্যার পর খৃষ্ট আবির্ভাবের পূর্ব-সন্ধ্যা পালিত হয় ওখানে। বেশ ভাল লাগল অনুষ্ঠানটি। তার পরের দিন ২৫শে ডিসেম্বর শ্রীমার (সারদা দেবীর) জন্মতিথি পালিত হয়। তাতে আমিও অংশ গ্রহণ করি। ধন্য হলাম এই সুযোগ পেয়ে।

১৯৫৬ সালে সাধনা তার জন্মদিন ৮ই জানুয়ারী পালন করে হটুগঞ্জ খাদি মন্দিরে গগন জানার আতিথ্যে। গগনের ত্যাগ ভাবনা ও মহাত্মাজীর আদর্শকে নিজ জীবনে রূপায়িত করার আকাঙ্ক্ষা খুব ভাল লাগল।

এরপর ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ায় নাক দিয়ে রক্তক্ষরণজনিত রোগে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ি। রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান, নার্সিং হোম ও ট্রপিকাল স্কুল অব মেডিসিনে চিকিৎসাধীন ছিলাম। রোগের কারণ নির্ণীত হয়নি। তবে ভগবানের অনুগ্রহে ও ডাঃ দেবজীবন বসুর সুচিকিৎসায় রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়েছে। এইবার বুঝলাম হাসপাতালে যাওয়া পরম দুর্ভাগ্য। নার্সরা প্রায় সবাই 'নামধারী'। অল্পসংখ্যক কয়েকজনের মধ্যেই আছে সেবাভাব।

এই অসুখের সময় কারো কারো কাছে যে প্রাণের পরশ পেয়েছি তা ভুলবার নয়। তাদের নাম লিখে তাদিকে বিব্রত করতে চাই না।

আজ জীবনসন্ধ্যায় উপনীত। জানি না কবে জীবনদীপ নিভে যাবে। ভগবানের নাম স্মরণ করতে করতেই যেন এ পৃথিবী হতে বিদায় নিতে পারি। আজ স্পষ্ট বুঝেছি সকলের কল্যাণেই ব্যক্তির কল্যাণ। আলাদা করে কারো কল্যাণ হয় না। কি শিশু কল্যাণ,

কি হরিজন কল্যাণ, কি উপজাতি কল্যাণ কোনোটাই আলাদা করে হয় না। ধরা যাক শিশু কল্যাণ। শিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে বা মার বুকের দুধ খায় তখন 'মা'র দৈনিক এক সের গরুর দুধ খাওয়া দরকার। শিশু কল্যাণের জন্যই মাতৃকল্যাণ অত্যাবশ্যক। চাই শরীর ও মন উভয়ের খোরাক। ভগবানের অনুগ্রহে সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় সবারই তা জুটুক এই বলে শেষ করছি জীবনস্মৃতির ভূমিকা।